সেলজুক সাম্রাজ্যের ইতিহাস

বই	**সেলজুক সাম্রাজ্যের ইতিহাস**
লেখক	ড. আলি মুহাম্মদ সাল্লাবি
ভাষান্তর	আরশাদ ইলিয়াস, হামেদ বিন ফরিদ
সম্পাদনা	নেসারুদ্দীন রুম্মান
শরয়ি সম্পাদনা	শাইখ আবদুল্লাহ আল মামুন
নিরীক্ষণ	মাহদি হাসান, ইমরান রাইহান
বানান সমন্বয়	মুহাম্মদ পাবলিকেশন সম্পাদনা পর্ষদ
প্রকাশক	মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
প্রচ্ছদ	আবুল ফাতাহ মুন্না
অঙ্গসজ্জা	মুহাম্মদ পাবলিকেশন গ্রাফিক্স টিম

সেলজুক সাম্রাজ্যের ইতিহাস

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

মুহাম্মাদ পাবলিকেশন

সেলজুক সাম্রাজ্যের ইতিহাস

ড. আলি মুহাম্মদ সাল্লাবি

প্রকাশকাল : বইমেলা ২০২১

প্রকাশনায়

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

ইসলামী টাওয়ার, ২য় তলা, দোকান নং # ৪২,
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৩১৫-০৩৬৪০৩, ০১৬২৩-৩৩ ৪৩ ৪২

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

অনলাইনে অর্ডার করুন
ওয়েলরিচ বিডি.কম-এ
www.wellreachbd.com
গিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স, শপ নং # ১২২,
৩৭ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৮১১-৫৭০ ৫৪০, ০১৬৩১-৩৪ ৫১ ৯১
অথবা **rokomari.com** & **wafilife.com-এ**

বইমেলা পরিবেশক
বাংলার প্রকাশন

মূল্য : BD ৳ ৫৯০, US $ 20, UK £ 15

HISTORY OF THE SELJUK EMPIRE

Writer : Dr. Ali Muhammad Sallabi
Translated : Arshad Ilyas, Hamed Ibn Farid
Editor : Nesar Uddin Rumman

Published by
Muhammad Publication
Islami Tower, 2nd Floor, Shop # 42
11/1 Islami Tower, Banglabazar, Dhaka-1100
+88 01315-036403, 01623-334342
https://www.facebook.com/muhammadpublicationBD/
muhammadpublicationBD@gmail.com
www.muhammadpublication.com

ISBN : 978-984-95222-1-8

স্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা, ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।

অর্পণ

নানাজান আল্লামা আবদুল মান্নান বিন হিদায়াতুল্লাহ
রাহিমাহুল্লাহর রুহের মাগফিরাত কামনায়।

—অনুবাদক

প্রকাশকের কথা

ইতিহাস অতীতের নীরব সাক্ষী। ইতিহাস চির-মুখর। যুগ-যুগান্তর ধরে মানব-সভ্যতার চলমান জীবনধারাই ইতিহাস। সে চক্রতীর্থের পথে পথে ছড়িয়ে আছে কত শত ভাঙা-গড়ার ইতিহাসের অর্ধলুপ্ত অবশেষ—কত রক্তরঞ্জিত দৃশ্যপটের পরিবর্তন; কত নিশীথকালে দুঃস্বপ্ন-কাহিনী; কত উত্থান-পতন, কত চেষ্টার তরঙ্গ, কত সামাজিক বিবর্তন।

আজ যা বর্তমান, কালই তা অতীত। ইতিহাস ত্রি-কাল-সূত্রে গ্রথিত। ইতিহাস তো অতীতেরই সত্য-স্বরূপ উদ্ঘাটন—এক অনন্ত মানব-জীবনপ্রবাহের অনির্বাণ দীপ-শিখা। ইতিহাস অতীতের অভিজ্ঞতা, বর্তমানের সাধনা, ভবিষ্যতের ইঙ্গিত। ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে আমরা মানবসমাজের শুরু থেকে এর যাবতীয় কর্মকাণ্ড, চিন্তা-চেতনা ও জীবনযাত্রার অগ্রগতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারি। এজন্যই ইতিহাসকে বলা হয় জাতির দর্পণ।

এ ইতিহাসের সাথে সম্পর্কসূত্রের ধারাবাহিকতায় আমাদের এবারের প্রকাশনা—*সেলজুক সাম্রাজ্যের ইতিহাস*। ইসলামি ইতিহাসে সেলজুকদের রয়েছে এক স্মরণীয় অধ্যায়। প্রায় ২০০ বছর ধরে তারা অর্ধ পৃথিবী শাসন করেছে অত্যন্ত প্রতাপ, বিক্রম ও ভাঙনের চড়াই-উৎরাই নিয়ে। মুসলিম-ইতিহাস অধ্যয়নে সেলজুক সাম্রাজ্যের ইতিহাসের রয়েছে অন্যতম ভূমিকা।

সে সাম্রাজ্যবিষয়ক পূর্ণাঙ্গ এ গ্রন্থটি আপনাদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আল্লাহর দরবারে চিরকৃতজ্ঞ। তাঁর একান্ত কৃপায় এটি সম্ভব হয়েছে।

বইটি দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ড অনুবাদ করেছেন তরুণ আলেম জামেয়া দারুল মা'আরিফ ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট আরশাদ ইলিয়াস ও মুফতি হামেদ বিন ফরিদ।

দ্বিতীয় খণ্ড অনুবাদ করেছেন মুফতি হামেদ বিন ফরিদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের মেধাবী ছাত্র শাহরিয়ার মাহমুদ ও মিসবাহ উদ্দিন। তাদের সকলের কাছেই আমরা কৃতজ্ঞ। তাদের অত্যন্ত ব্যস্ততার মাঝেও তারা আমাদেরকে সময় দিয়েছেন; এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ আপনাদের হাতে তুলে দিয়েছেন।

ইতিহাসের বই অনুবাদই শেষ কথা নয়; বরং ইতিহাসের বই অনুবাদ হলো বইয়ের প্রথম কাজ। এরপর শুরু হয় আরও নানান ধরনের কাজ। বিভিন্ন স্থান, স্থাপনা, ব্যক্তি, মুদ্রাসহ হরেক জিনিসের নামের সঠিক উচ্চারণ, সন-তারিখের নির্ভুল প্রয়োগ খুব অনায়াস ব্যাপার নয়। তথ্য-নিরীক্ষার এ কঠিন কাজটি করে বইটিকে আরও নির্ভরযোগ্য করেছেন মাহদি হাসান, ইমরান রাইহান। আমরা তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞ।

মুহাম্মদ পাবলিকেশন এ পর্যন্ত ইতিহাসের বেশ ভালো ও গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজ আপনাদেরকে উপহার দিয়েছে। এ বইটিও গুণে-মানে সে কাতারের হলেও সেগুলোর চেয়ে কিছু ভিন্নতার জন্য কাজটি যেমন আলাদা গোছের, তেমন জটিলও। কারণ, এ বইটিতে উপরের কাজগুলোর সাথে যুক্ত হয়েছে শরয়ি সম্পাদনা। ইমাম আবুল হাসান আশআরির আলোচনাসহ বইয়ের বিভিন্ন জায়গায় আকিদাগত বিষয় সম্পৃক্ত রয়েছে। সেসব জায়গা আমরা ফিকহে হানাফির অনুকূলে আকিদার মাসআলার ক্ষেত্রে দীর্ঘ টীকা জুড়ে দিয়েছি। আর এ গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করেছেন শায়খ আবদুল্লাহ আল মামুন। আমরা শায়খের দীর্ঘ নেকহায়াত কামনা করছি।

থেকে যায় ভাষা-সম্পাদনা, বানান ও আনুষঙ্গিক আরও কিছু বিষয়। এ কাজটি সম্পাদিত হয়েছে আমাদের প্রিয়মুখ নেসারুদ্দীন রুম্মানের হাতে। তার সম্পাদনার ব্যাপারে নতুন করে কিছু বলার নেই; অবশ্য মাঝের একটি পরিচ্ছেদ সম্পাদনা করেছেন খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ। আল্লাহ তাদের উভয়কেই উত্তম বিনিময় দান করুন।

আমাদের যা কিছু ভালো সবই মহান রবের পক্ষ থেকে; আর যা অসুন্দর ও ত্রুটিযুক্ত তার আমাদের সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা থেকে। আমাদের ভুলগুলো ক্ষমা করে উত্তম বিনিময় দান করুন।

—মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান

১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

অনুবাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি আমাদেরকে তাঁর মনোনীত ধর্ম ইসলামের উপর অবিচল থাকার তাওফিক দান করেছেন। অসংখ্য দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক বিশ্বমানবতার মুক্তিদূত হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবায়ে কেরামের উপর।

ইতিহাস মানুষের ভবিষ্যত-জীবনের পথ সুস্পষ্ট করে দেয়। যিনি যত বেশি অতীত সম্পর্কে ধারণা রাখেন, তিনি তত বেশি সতর্ক হয়ে ভবিষ্যত রচনা করতে পারেন। কারণ, অতীতের ঘটনাগুলো তাকে সতর্ক করে দেয়। কোন পথ সুগম আর কোন পথ দুর্গম, ইতিহাস তার পাঠককে সেটা বুঝতে সহায়তা করে। সেজন্যেই ইতিহাস মানবজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সেলজুক সাম্রাজ্য ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এ সাম্রাজ্য ছিল ইসলামি ভূখণ্ডের অত্যন্ত প্রভাবশালী সুন্নি মুসলিম সাম্রাজ্য। আব্বাসি খলিফা কাদের বিল্লাহ'র যুগে শুরু হয় সেলজুকদের উত্থান। পরবর্তী খলিফা কায়েম বি-আমরিল্লাহর যুগে সেলজুকরা নিজেদের সুসংগঠিত করে। এমনকি বাগদাদ নিয়ন্ত্রণ-করা শক্তিশালী বুওয়াইহিদের হটিয়ে একসময় তারা বাগদাদের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। এর পর ১০ শতকের শুরু থেকে ১৪ শতক পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল মধ্য এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্য শাসন করে সেলজুকরা।

মহান এ সাম্রাজ্যের স্থপতি ছিলেন সুলতান তুঘরিল বেগ। সুলতান মালিক বেগের শাসনকালে এ সাম্রাজ্য মহান আল্লাহর দয়ায় এবং সেলজুকদের

সামরিক যোগ্যতাবলে সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে যায়। বিস্তৃতি লাভ করে প্রায় অর্ধ পৃথিবী পর্যন্ত। রাজনৈতিক ও ধর্মীয়—উভয় ক্ষেত্রেই সেলজুক সাম্রাজ্য ইসলামি মূল্যবোধে এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব রেখেছিল।

সেসময় প্রতিষ্ঠিত 'নিজামিয়া' মাদরাসাগুলোকে ইসলামি ইতিহাসের সর্বাধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বলে বিবেচনা করা যায়। ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক দায়িত্বপালনে সক্ষম যুগের বিরলপ্রজ অসংখ্য প্রতিভাবান দার্শনিক, শিক্ষাবিদ এবং গুণীজন এ মাদরাসাগুলো থেকে জন্ম নিয়েছেন।

নৃশংস ক্রুসেড যুদ্ধের প্রথম দুই অভিযানের ইতিহাস সেলজুক সাম্রাজ্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রথম ক্রুসেডের অন্যতম লক্ষ্যই ছিল সেলজুক সাম্রাজ্য। ফলে মুসলিম ভূখণ্ডে ক্রুসেডার-আগ্রাসন প্রতিহতকরণে সেলজুকদের অবদান অনস্বীকার্য। অধিকন্তু সেলজুক আমলে বিভিন্ন বাতিল ফিরকার বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ে আহলুস সুন্নাহর বিজয় সাধিত হয়েছিল; দমিত হয়েছিল ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য বড় ধরনের ফিতনা হয়ে-ওঠা বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদের। এ কারণে আহলুস সুন্নাহর অনুসারীদের কাছে সেলজুক সাম্রাজ্যের ইতিহাস সবিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

বাংলা-ভাষায় সেলজুক সাম্রাজ্যের ইতিহাস নিয়ে স্বতন্ত্র ও তথ্যবহুল কোনো কাজ হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। এ ব্যাপারে বাঙালি পাঠকদের জানার পরিধিও খুব একটা বিস্তৃত নয়। এখন যুগ পাল্টেছে। বাংলা-ভাষা সমৃদ্ধ হচ্ছে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায়। তারই অংশ হিসেবে আধুনিক প্রকাশনাজগতের আলোড়ন সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠান মুহাম্মদ পাবলিকেশন নিয়ে এসেছে ইতিহাসের এক অনবদ্য গ্রন্থ—সেলজুক সাম্রাজ্যের ইতিহাস।

গ্রন্থটি মূলত সমকালে সাড়াজাগানো শ্রেষ্ঠ ইতিহাসবিদ ও গবেষক ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি রচিত *দাউলাতুস সালাজিকাহ*-এর পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ। ইতিহাসশাস্ত্রে ড. সাল্লাবির পারঙ্গমতা সর্বজনবিদিত। আরব-অনারবে তার লেখনীর বিস্ময়কর গ্রহণযোগ্যতা এরই প্রমাণ বহন করে। প্রত্যেকটি বর্ণনার ক্ষেত্রে নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র সংযোজন তার রচনাবলিকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি কোনো দিক থেকে এর ব্যতিক্রম নয়।

বাল্যবয়স থেকে আরবিমাধ্যম প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করার সুবাদে ভাষাটির সাথে বেশ মোহমুগ্ধ সখ্য গড়ে ওঠে। পড়াশোনার অংশ হিসেবে আরবি

থেকে বাংলা, বাংলা থেকে আরবি প্রচুর অনুবাদও করতে হয়েছে। এভাবে আল্লাহর বিশেষ রহমত এবং স্নেহশীল শিক্ষকগণের নিঃস্বার্থ যত্ন ও তত্ত্বাবধানে অনুবাদকর্মে মোটামুটি একটা ধারণা তৈরি হয়। এরপর থেকে সমকালীন আরবি লেখকদের বিভিন্ন আর্টিকেল অনুবাদ করতে শুরু করি। ২০১৬ সালে বাংলাদেশ ইসলামী লেখক ফোরামের 'লেখালেখি ও সাংবাদিকতা প্রশিক্ষণ কর্মশালা'র মাধ্যমে আমার লেখালেখির আনুষ্ঠানিক সূচনা করার সুযোগ হয়। সে বছরই *মাসিক ইসলামী বার্তা*-এর ঈদসংখ্যায় আমার একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এরপরে বিভিন্ন বইয়ে সহযোগী অনুবাদক হিসেবে কাজ করার সুযোগ ঘটে। ২০১৯ সালের শেষদিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকের কল্যাণে প্রকাশক তরুণ আলেম, লেখক ও অনুবাদক আবদুল্লাহ খান সাহেবের সাথে পরিচয় হয়। আমার বিভিন্ন পোস্ট ও আরবি নিয়ে করা টুকটাক কাজ দেখে তিনি অধমকে ইনবক্সে নক করেন; বক্ষ্যমাণ বইটির অনুবাদ করার প্রস্তাব দেন। তার কথায় উৎসাহ পাই; কিন্তু এত বড় একজন লেখকের বৃহৎ কলেবরের বই অনুবাদ করার সাহস করতে পারছিলাম না। শেষত আবদুল্লাহ ভাইয়ের সাহসদান কাজটি গ্রহণে প্রত্যয় জোগায়।

সৃজনশীল প্রকাশনা-প্রতিষ্ঠান মুহাম্মদ পাবলিকেশন এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে শরিক করে সত্যিই আমাকে কৃতজ্ঞতার চাদরে ঢেকে নিয়েছে। ইচ্ছা ছিল—প্রথম খণ্ডের পুরো কাজটি একাই শেষ করব। কিন্তু পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক বহুমুখী ব্যস্ততার কারণে পুরো বইটি অনুবাদ করতে অপারগতা প্রকাশ করতে হয়। ফলে এ খণ্ডের শেষদিকে তরুণ আলেম জামেয়া দারুল মা'আরিফ ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট মুফতি হামেদ বিন ফরিদ ভাইকে আমার সহযোগী হিসেবে গ্রহণ করি।

এছাড়াও অনুবাদকর্মে কয়েকজন বিজ্ঞ আরবি ভাষাবিদ ও ইতিহাস-বিশেষজ্ঞের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। মূল লেখকের তথ্যসূত্রের পাশাপাশি নিজের পক্ষ থেকেও কিছু তথ্যসূত্র ও টীকা সংযুক্ত করেছি। এক্ষেত্রে আরবি ও ইংরেজি-ভাষার উইকিপিডিয়াসহ বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য সাইটের সাহায্য নিয়েছি।

অনুবাদ নির্ভুল করতে এবং মূল বইয়ের ভাব ও আবেদন ধরে রাখতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তবুও মানুষ হিসেবে ভুল থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। কোথাও কোনো ভুল পরিলক্ষিত হলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার এবং প্রকাশনী বরাবর অবহিত করার বিনীত অনুরোধ রইল। একে বই ও

প্রকাশনা-সংশ্লিষ্ট অনেক বড় অনুগ্রহ হিসেবে গ্রহণ করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে বইয়ের পাঠকপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা কামনা করে এবং লেখক, অনুবাদকবৃন্দ, সম্পাদক ও প্রকাশক, প্রচ্ছদশিল্পী এবং অন্যান্য সহযোগীদের জন্য আল্লাহর কাছে বিনিময় চেয়ে 'অনুবাদকের কথা'র ইতি টানছি।

—মুহাম্মাদ আরশাদ ইলয়াস
পূর্ব বৈলছড়ি, বাঁশখালি, চট্টগ্রাম
১০ ডিসেম্বর ২০২০ ঈসায়ি

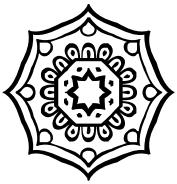

সেলজুক-ইতিহাস : সম্পাদকীয় ও বিবিধীয়

যে-কোনো বিগত বিবরণই তো ইতিহাস; কিন্তু সব বিগত বিবরণ বা ইতিহাসই তো একরকম নয়। কোনো-কোনো বিগত বিবরণ পাপ, ধ্বস ও ধ্বংসের কারণ; আর কিছু-কিছু বিগত বিবরণ গৌরবের; কিছু বিবরণ আমাদের হঠাৎ সচকিত করে; কিছু বিবরণ শিক্ষা দেয়; কিছু বিবরণ মেলাতে শেখায় গতিপথ—রাষ্ট্র, ক্ষমতা ও সময়ের। পাপ ও ধ্বস নেই যে-বিবরণের কারণে—তা বিগত, বর্তমান বা ভবিষ্যের হোক—তাতে কিছু-না-কিছু শিক্ষা তো রয়েছে; হয়তো আনন্দ, নন্দন ও আমোদও। এ-সব খুব আটপৌড়ে কথা। সবাই জানি। কিন্তু জানি না যে-কথা, বা জানি—কিন্তু সচেতনতায় তা জেগে নেই, দূরে কোথাও পড়ে আছে এখনো-ছোঁয়াহীন—নৈমিত্তিক দুনিয়া থেকে দূরে—তা হলো : ইতিহাস আমরা তৈরি করি।

ভুল বুঝবেন না; 'ইতিহাস আমরা তৈরি করা'র অর্থ 'আমরাই তো ইতিহাস', 'ইতিহাস আমরা বানাই', 'আমরা যা করি, তা-ই তো ইতিহাস'-ধরনের গৌরব-দেখানো বা বুক-ফুলানো কথা নয়; 'ইতিহাস আমরা তৈরি করি' কথাটির অর্থ : ঘটিত বিষয়কে আমরা নিজেদের বিবেচনা, পছন্দ ও রুচিমাফিক নির্মাণ করি; প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাসহ গ্রহণ করি।

জ্ঞানদুনিয়ার কোনো বিবরণই এ পথ মাড়ানো ছাড়া বিবরণ হয়ে ওঠে না—ইতিহাস তো নয়ই। এর বাইরে হয়তো শুধু রয়েছে শিশুর বোল আর পাগলের প্রলাপ। ইতিহাস-রচনার এ বিবেচনা, পছন্দ ও রুচিকে অল্প কিছু মানুষ বৈদগ্ধে পরিণত করতে পেরেছেন; এর স্বল্প কিছুই মানবমণ্ডলির জন্য হয়ে উঠেছে প্রজ্ঞাবিকীর্ণ আলো। আর অনেক মানুষ রচনার এ বিবেচনা,

পছন্দ ও রুচিকে করে তুলেছেন স্বার্থ; এ-স্বার্থ শুধু অর্থ-বিত্ত বা বৈভবের নয়; মানবমনের অসংখ্য গলির মতোই এর অজস্রতা; বরং বলা যায়, যত গলি, হতে পারে, তত রকম স্বার্থের উৎপাতেই এ মুহ্যমান। আর এ অজস্র গলিপথ ধরে ইতিহাসে যে কত কিছু ঘটে গেছে, তা বলে শেষ করার নয়; আমরা জোড়াতালির পাঠকই তো তা টের পাই; শাস্ত্রজ্ঞ বোদ্ধাজন আরও ভালো বলতে পারবেন।

ইতিহাস যেহেতু একটি শাস্ত্র, এর রচনার বিধি আছে; আছে বিধিবদ্ধ রূপ, রেখা ও কাঠামো। কিন্তু ইতিহাসের রচনাসম্ভারের দিকে তাকালে এ-সত্যকে আপনার কাছে অবাঞ্ছিত মনে হবে। মুক্ত জ্ঞান ও রচনার নাম নিয়ে পৃথিবীর প্রতিটি কিনারা ভরে দেওয়া হয়েছে অজস্র তথ্যে; এর সব যে সত্য, নিরেট ও নিখাদ নয়, তা জানি বটে, কিন্তু এ জানি না—কোন তথ্যটি সত্য, নিরেট ও নিখাদ! ফলে অতীত-জ্ঞানশূন্য আমাদেরকে তথ্যের জাদুতে আটকে ফেলা খুব সহজ। সহজ এজন্যও, জ্ঞানদুনিয়ায় যে রয়েছে অনেক ষড়যন্ত্রতত্ত্ব, এর অনেক কিছুকে আমরা 'কন্সপিরেসি থিওরি'-মার্কা হাসি-ঠাট্টা মনে করি; কিন্তু 'কন্সপিরেন্সি' যে আসলেও রয়েছে, তা ভাবতে পারি না বা যাচাই করে দেখি না।

সত্যিই অনেক চোরাগলিতে রচিত 'আমাদের-জানা ইতিহাস'। কিন্তু 'আমাদের-জানা ইতিহাস' কি ইতিহাস কি না, তা বোঝা যাবে না ইতিহাস-রচনার বিধিত রূপ ও পন্থা কী, তা জানা না-থাকলে। তাই ইতিহাস পাঠের পাশাপাশি প্রয়োজন এ-শাস্ত্র রচনার সিদ্ধ রূপরেখা জেনে নেওয়া; আর সাথে-সাথে সচেতন পাঠকের এও লক্ষ রাখা উচিত, তিনি যা পড়ছেন, তা কী উপায়ে রচিত—কোন বিবেচনা, পছন্দ ও রুচির পথ ধরে নির্মিত হয়েছে সে-তথ্যসম্ভার। তা না-হলে প্রিয় পাঠক, যাচ্ছে-তা-ই আপনাকে গেলানো যাবে। পাঠ তো গোগ্রাস নয়! পাঠকে গোগ্রাসে পরিণত করার চেয়ে দুঃখজনক কিছু কি আছে?

❋❋❋

ইতিহাস-পাঠের আনন্দটা হলো এই, লেখক যতটুকু লিখে দ্যান, অতটুকুই শেষ কথা নয়; এর মর্মনিহিত অর্থ ধরে যাওয়া যায় আরও অনেক দুনিয়ায়—এ এক বিস্তৃত পরিভ্রমণ। চোখ-কান খোলা রেখে পাঠ করলে একটি ঘটনাই ইতিহাস; তা না-পারলে হাজার পৃষ্ঠার আখ্যান ও পট-নির্মাণও অর্থময় কোনো কিছু নয়।

ইতিহাস যখন কোনো মনীষার কথা বলে, সেখানে সবার আগে মূর্ত হয়ে ওঠে মন গোছানোর অসংখ্য উপাদান; জেগে ওঠে অনেক-অনেক স্বপ্নের চর; ফুটতে থাকে অনেক সৌরভমথিত ফুল; ত্যাগ ও সাধনার অসংখ্য সমুদ্র তখন গর্জন করতে থাকে; আমরা অধিকাংশেই হয়তো মনীষার অসম্ভব সে-দ্যুতিতে পরাজিত হই; কিন্তু এও সত্য, ইতিহাসের এ-পাঠই কারও মনের তলে একটি কুঁড়ি জাগিয়ে যায়; গাজালির জীবনের প্রাণনা সে-কুঁড়িকে হয়তো গাজালি করে না; কিন্তু কে বলতে পারে, ওই কুঁড়ি বুকে নিয়েই কেউ একদিন আলোকিত করবেন তার নিশাপুর!

রাজ-রাজড়া আর সাম্রাজ্যের ইতিহাস যে কত বিস্তৃত, ভালো একটি সংকলন হাতে না-নিলে আপনি টের পাবেন না! একটি সাম্রাজ্য কত অজস্র জ্ঞানী-গুণী আর কুটিল-জটিল মানুষের পৃষ্ঠা যে মেলে দ্যায় সামনে, সামলে ওঠা দায়। পড়তে-পড়তে মনে কত অজস্র বিমিশ্র অভিঘাত যে আছড়ে পড়ে, কোথাও এর লেখাজোখা নেই; বর্তমানে ফিরে এসে মনে হয়—আজও তো, যা পড়লাম, তার মধ্যেই আছি; 'ইতিহাস পুনরাবৃত্ত'—এ-কথার সত্যতা ধরা পড়ে; আরও ধরা পড়ে এমন-সব আরাধ্য, যা কোনো দিন পাওয়া যাবে, কল্পনায় ছিল না!

পড়ে মনে হতে পারে গুলপট্টি; কিন্তু সত্যিকার অর্থেই যার ইতিহাস-পাঠ অতীত-ভ্রমণ—তার দৃষ্টি আর দ্রষ্টব্য পালটে গেছে! হাসান আস-সাব্বাহ'র চিঠি পড়ে তার কাছে মিথ্যেকেই মনে হয়েছে মিথ্যে; গাজালির আলো-বিকিরিত পৃথিবীতে ঢুকে সারা জীবন-জগতকেই লেগেছে নিষ্প্রভ; তুরকান খাতুনের হাতে ক্ষমতার বাগডোর দেখে মনে হয়েছে—কী হয় কী হয়; সবুজ পাখির পেটে সমাধিস্থ হতে চাওয়া আলপ আরসালানকে মনে হয়েছে—ঈপ্সিত মুরাদের পথে বের-হওয়া এ এক অচিন মানুষ; নিজামুল মুলক যেন রাজনীতির পোড়-খাওয়া অবিসংবাদিত কোনো সাধক; আব্বাসি আর সেলজুক সাম্রাজ্য বেঁচে আছে যেন একটি প্রদীপের আগুন আর সলতে হয়ে; আর, বিমূঢ় পাঠক ভেবে পায়নি, এক সুন্দরী নর্তকী কীভাবে বলতে পারে এমন প্রজ্ঞাবিভূত সংলাপ :—'হালাল ও হারামে শুধুমাত্র একটি শব্দের পর্দা, জাহাঁপনা!'

❋❋❋

মহান আল্লাহর কাছে আমি আশা রাখি, যদি আমার ভাগ্যে শাহাদাত নসিব হয়, তবে ধূলিময় শকুনের থলে থেকে সবুজ পাখির থলেতে আমার সমাধি হবে। আমি বিজয়ী হলে আমার গতকাল আমাকে সুখী করতে পারবে না; বরং আমার আজই গতকালের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হবে।

—আলপ আরসালান

একটি সাম্রাজ্যের ইতিহাস-পাঠকে আপনি কোন বিবেচনায় পড়বেন, তা অনেকে ঠিক করে দিতে চাইলেও এ ঠিক করে নেওয়াটা শেষ পর্যন্ত বোধহয় নিজের কাছেই থাকে। কুরআন-নাজিল ও রাসুলের আগমন আমাদের একটি ব্যাপার শেখায়—'সঠিকের উপস্থিতি' আর এর 'পরিবেশ তৈরি'ই জগৎ সঠিক করার এলাহি পদ্ধতি; 'কুরআন-নাজিল' যে সঠিকের উপস্থিতি আর 'রাসুলের আগমন' যে পরিবেশ তৈরির রূপক, তা বোধ করি পাঠক বুঝেছেন। আরোপ করে, জোর চালিয়ে কোনো কিছু প্রতিষ্ঠা করা যায় না; গেলে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল করতেন।

'আরোপ' আর 'জোর' বললে কি আপনার কল্পনায় জিহাদের কথা মনে পড়ে! হালকা ধোঁয়াশার মতো মনের কাঁটা গোপনে ইকটু ওদিকেই নড়ে ওঠে! জানি না, উত্তরে কী বলবেন; কিন্তু মর্মন্তুদ সত্য হলো এই, আমাদের অধিকাংশের অবস্থা তা-ই। আমাদের অনিচ্ছেয় হোক বা ইচ্ছেতে—হাল এই হলে এ-কথা নির্দ্বিধ দায়িত্বে বলা যায়—জিহাদ কাকে বলে, আমরা তা বুঝিনি! এখনো আমরা 'দুইয়ে-দুইয়ে চার মানে সমতা'র বোকা খেলায় আটকে আছি। তাই রক্ত মানেই ভাবি—আরোপ; প্রতিরোধ মানেই ভাবি—জোর; আগাছা সরিয়ে দেওয়াকে ভাবি—সন্ত্রাস।

আমাদের দ্বিনি বোধ আজ হাজার-রকমভাবে রাহাজানির শিকার, ছিনতাই হয়ে গেছে আমাদের রাসুলের অনেক-অনেক উসওয়া; ফুলে টোকা পড়লে যে-রাসুল ব্যথিত হতেন, সে-রাসুলই বিপুল প্রতাপে পরেছিলেন বর্ম—ছুড়েছিলেন লক্ষ্যভেদী বর্শা; ফুলের টোকার সংবেদনা আর বর্ম-বর্শার বিক্রম না-মেলাতে পারা—আমাদের ব্যর্থতা! তবে এমন ব্যর্থতা নয়, যা শুধু স্বীকার করে নত হলেই পার; বরং এমন ব্যর্থতা, যা মেনে নিয়ে, তা ধারণ করতে হবে—হৃদয়ে লালনে ব্রতী হতে হবে।

মুসলিমদের ইতিহাস মানেই ইসলামের ইতিহাস কি না, মুসলিমদের রাজত্ব মানেই ইসলামি রাজ্য কি না, তা নিয়ে হয়তো চিন্তাশীলরা তর্ক করবেন; কিন্তু 'জিহাদ চলবে কেয়ামত পর্যন্ত'—এ বাণী তর্কাতীত সত্য। আর জিহাদ যেহেতু মুসলিমেরই দায়িত্ব, তাই কেয়ামত পর্যন্ত মুসলিমদের সংগ্রাম, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ ও বিপ্লবকে জিহাদ বা জিহাদপ্রস্তুতির ক্রমধারাবাহিকতা

হিসেবে দেখার সুযোগ রয়ে যায়। তাই মুসলিমের সংগ্রামকে জিহাদের সম্ভাবনাময় ব্যাকুলতা নিয়ে দেখার ব্যাপারেই আমার পক্ষপাত; হয়তো ভালোবাসার এ-পক্ষাবলম্বন—উম্মাহর জীবন থেকে রাসুলের উসওয়া জিহাদের সামগ্রিক বিলোপবেদনার উপশম এ-পক্ষপ্রীতি সোনালি দিনের প্রথম সকালের মতো আবার আমাদের রাসুলের কাছাকাছি নিয়ে যাবে; 'সঠিকের উপস্থিতি'র 'পরিবেশ তৈরি' করবে।

আমরা কি হতে চাইব না সবুজ পাখির উদরে-রক্ষিত সে-শহিদ, যে-পাখি উড়বে জান্নাতে, ঘুরবে আরশে মোয়াল্লার আলোঝাড়ে!...

❋❋❋

ড. আলি সাল্লাবির সংকলিত মুসলিমদের গৌরবময় ইতিহাস-রচনা শুধু তার ভাষাতেই নয়, গত কিছু বছর যাবৎ বাঙলাভাষী পাঠকদের প্রিয় পাঠ্য। এ-যাবৎ বাঙলায় তার বহু বই প্রকাশিত ও সমাদৃত হয়েছে। আশার ও সুখের কথা হলো, তার প্রতি পাঠকের সে-সমাদর ফুরিয়ে যায়নি; বরং দিনদিন তা বাড়ছে। সে-ধারাবাহিকতায় প্রিয় পাঠক, ড. আলি সাল্লাবি রচিত *দাউলাতুস সালাজিকাহ*-এর বাঙলা ভাষান্তর *সেলজুক সাম্রাজ্যের ইতিহাস* প্রকাশিত হলো। বাঙলা-ভাষায় এর প্রকাশ করল সম্ভ্রান্ত প্রকাশনা-প্রতিষ্ঠান—মুহাম্মদ পাবলিকেশন।

মূল গ্রন্থের মতো বাঙলা এ-অনুবাদভাষ্যটিও পাঁচটি অধ্যায় ও সাতাশটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত। এতে ক্রমান্বয়ে পুরো সেলজুক সাম্রাজ্য ও এর খুঁটিনাটি তুলে ধরা হয়েছে; জাতি, সাম্রাজ্য আর রাজ-রাজড়াদের তথ্যমাত্রেই সীমিত না-রেখে এর আয়তনকে পরিব্যাপ্ত করা হয়েছে গোটা সাম্রাজ্যব্যবস্থার কার্যকরী সকল বিষয়ে; লেখকের ভূমিকায় এর আদ্যোপান্তের খোঁজ পাওয়া যাবে।

ক্ষমতা-কাঠামো কীভাবে কাজ করে, কীভাবে করে নানান ধরনের সম্পর্কের বোঝাপড়া—পুরো বই জুড়ে তার ছাপ রয়েছে। সবার পাঠ-বিবেচনা সমান হয় না বিধায় এ-নুকতাটুকু দিয়ে রাখলাম এজন্য যে, নিছক একটি সাম্রাজ্যের ইতিহাসের বাইরেও বিশ্ব-রাজনীতির পাঠ হিসেবেও এ-রচনা পড়া যাবে। পরন্তু রাজনীতিজ্ঞ উজির নিজামুল মুলক এবং সমাজচিন্তক মহাত্মা ইমাম গাজালির মতো ব্যক্তিত্বের অধিষ্ঠান যে এ-সাম্রাজ্যেই হয়েছিল, এতদুভয়ের অঙ্কুর ও বিকাশের বিস্ময়কর বিভাও এ-

ইতিহাসগ্রন্থ ধারণ করে আছে। সন্দেহ নেই, এ পাঠকের বিশাল-রকম প্রাপ্তি।

আর চতুর্থ অধ্যায়ে গ্রন্থিত 'সেলজুক আমলে মাদারিসে নিজামিয়া'-শীর্ষক শিরোনামটি—আমার মতে—নিজ ব্যাপ্তি বোঝাতে অক্ষম। জ্ঞানজগতের কত দীপ্তিমান মনীষাদের যে কোল দিয়েছে এ-শিক্ষাব্যবস্থা, এ-অধ্যায় না-পড়লে বোঝানো যাবে না; এমনকি বোঝানো যাবে না মুসলিমদের জ্ঞানদুনিয়া কত হাজার দিগন্তে ডানা মেলেছিল সেই চতুর্দশ শতাব্দীতেই! এ এক আশ্চর্য মিছিল, পাঠক—এ এক মোহন সুরভি!

প্রথম ও পঞ্চম অধ্যায় থ্রিলার ফিকশনের মতো। গজনভি সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়ে সেই যে শুরু—তারপর এক দিকে ফাতেমি, বাতেনি আর বাইজেন্টাইনদের উৎপাত, অন্য দিকে লাগাতার ক্রুসেড যুদ্ধের মোকাবেলা এবং ভীষণ-স্নায়ুচাপে-বদ্ধ নিজেদের অন্তর্কলহের উপাখ্যান। বাতেনি-রাফেজি-কারামিতাদের কাণ্ডকারখানা পড়লে পৃথিবীর যে-কোনো ষড়যন্ত্রকে আপনার নস্যি মনে হতে বাধ্য। এ-ছাড়াও আব্বাসিদের অকার্যকর ক্ষমতাব্যবস্থা, বাইজেন্টাইনদের বোকামি, ক্রুসেডারদের মহা ঐক্য এবং সেলজুকদের অন্তর্দ্বন্দ্ব—পড়তে-পড়তে নানা বিমিশ্র অনুভূতির শহরে আপনার প্রবেশ ঘটবে।

প্রথম পাঠে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচনা কম উত্তেজনাকর লাগলেও পঞ্চম অধ্যায়ে গিয়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় নিজ জানলা খোলা শুরু করে; তখন আর মনে হবে না, ওই দুই অধ্যায়ের আলোচনা কম উত্তেজক ছিল।

পাঠক, আপনার পাঠ-উদ্দীপনা জাগিয়ে দিতে বইয়ের এতটুক পরিচিতি ধরা থাকল। জানার কৌতূহল থাকল, আপনিও *সেলজুক সাম্রাজ্যের ইতিহাস* বইটি এভাবে দেখছেন কি না! নাকি দেখছেন—আরও কোনো মহৎ, সুন্দর উপায়ে বা বহুবিস্তারী চোখে!

❋❋❋

বইটির প্রথম খণ্ড অনুবাদ করেছেন আরশাদ ইলয়াস এবং হামেদ বিন ফরিদ। দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদে ছিলেন—হামেদ বিন ফরিদ, শাহরিয়ার হাসান ও মিসবাহ উদ্দিন।

অনুবাদে নানামুখী নিরীক্ষায় বইটির বিষয়বস্তু ও সম্পন্নতার মানবর্ধনে কাজ করেছেন মাহদি হাসান ও ইমরান রাইহান। এ-দুজনেই স্ব-কীর্তিগুণে ইতিহাস-চর্চার সাম্প্রতিক ধারায় নিজেদের মেধা ও গুণপনা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাদের কাজের সশ্রম ছাপ পুরো বই জুড়েই ফুটে ছিল। নিজেদের মেধা ও সুকৃতিতে তারা এভাবেই ফুটে থাকুন—সে-কামনা।

দু খণ্ডের বৃহৎ কলেবরে সমাপ্য কাজটির সম্পাদনা-ভার দিয়ে আমাকে অনেক কাজে বেঁধে দিয়েছেন মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান। যেকোনো মানুষের কাছ থেকে কাজ বাগানোতে ইতিমধ্যে তিনি নাম কুড়িয়েছেন। কাজটি তিনি কীভাবে করেন, সুনির্দিষ্টভাবে জানি না; তবে কাজ বাগাতে যত বেগই লাগুক, তার মুখোমুখি তাকে হতে দেখেছি।

একহারা গড়নের এ-মানুষকে দেখলে মনে হয় না—প্রকাশনীর বই নির্বাচন থেকে শুরু করে লেখক-সম্পাদক-অনুবাদক, নিরীক্ষক ও প্রফরিডার—সকলকে তিনি একাই সামলান; ঘুরে বেড়ান ছাপাখানা, বইমেলা আর প্রকাশনী-পরিচিতির ব্যপদেশে নানান শহরের আনাচে-কানাচে; বইয়ের পৃষ্ঠাসজ্জায়ও নিজেকেই জুড়ে রাখেন। এত কাজ শুধু তিনিই করতে পারেন—কাজ ছাড়া যার আর কোনো কাজ নেই। তার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

এ-বাস্তব স্বীকৃতিটুকু কাগজে এজন্য তুলে রাখলাম, নিজের কাজের কথা যেন তিনি কখনোই না ভোলেন; কোনো দিন খ্যাতি, প্রসিদ্ধি, প্রভাব বা ক্ষমতা যেন তার মৌলিকত্বটুকু ধুয়ে না-ফেলে।

কৃতজ্ঞতা মুহাম্মদ শামিমের প্রতিও; তিনি দিন-রাত আবদুল্লাহ খানকে সঙ্গ দিয়ে তার কাজ সহজ না-করে তুললে খান খুব মুশকিলে পড়তেন। শামিম, আপনার ভালো হোক।

সম্পাদনা-কাজে আমাকে নানান জটিলতা থেকে মুক্ত করেছেন সুহৃদ ও প্রিয়জন আল-আমিন ফেরদৌস ও মাহফুজুর রহমান। আল-আমিন ফেরদৌস একটি বই অনুবাদ করেই ইতিমধ্যে বইবাজারে নিঃশব্দ-সুন্দর সাড়া ফেলেছেন; অনেক চোখের অভিমুখ এখন তার দিকে—কী সুখের কথা! আর মাহফুজুর রহমান আমার ভ্রাতৃপ্রতিম অগ্রজ—তার কথা কী বলব! আশা করি, তার গুণপনা ছড়িয়ে পড়তেও আর বেশি বাকি নেই। তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা।

এত বড় কলেবরের বই, সম্পাদনা-কাজে বারবার ধৈর্য ছুটে যেত। মানসিক গলদঘর্ম-কষ্টে অনেকসময় নিশ্চুপ বসে থাকতাম একা-ঘরে—অন্ধকারে। কাজের দরকারে আবার ফিরে আসতে হতো কাজের টেবিলে। তবু, কাজে নিষ্ঠার খামতি হতে দিইনি এতটুকু। যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি নিজ কাজ সম্পূর্ণ করার। সে-সম্পূর্ণতা বা পরিশ্রমের সার্থকতা-ব্যর্থতা—দুইই থাকল দুই মলাটের অন্দরে। বাকি কথা তো আপনাদের বলার। অবার আয়াসে সে-কথাটুকু জানানোর বিনীত ও বিশেষ অনুরোধ থাকল।

❋❋❋

একটি কাজ শেষ হলেই, তা যত ছোট হোক আর বড়, কিছু মুখ মনে পড়ে। পড়ে এজন্যই কি নয়—এ-মুখগুলোর সাথেই জীবন-জগৎ বাঁধা! আম্মু, সিফাতাপু, রুবা—তোমাদের জন্য ভালোবাসা।

শিমুল দিনদিন দেখছে, আমি আরও এবং আরও ব্যস্ত হয়ে উঠছি। শে জানছে, ব্যস্ততায় কাটা পড়ছে আমার সব কিছু—শে, এমনকি আমিও। কিন্তু তার মুখ আগের মতো করুণ হতে দেখি না। সব শান্ত-হাতে একাই সামলাতে শিখে যাচ্ছে। শে কি জানে, সময়ের জেরে শতচ্ছিন্ন আমাদের সময়গুলোর জন্য আমার একাকী খুব মন খারাপ হয়?

যাকে বলার থাকে অনেক কিছু, তাকে কিছুই বলা হয় না—এ-ই নিয়তি। তার উদ্দেশে একদা লিখেছিলাম—

আমার সমস্ত চারণের পথে
তুমি উচিতময় বারণের অলঙ্ঘ্যনীয় সীমানা টেনে দিয়েছ—
তাই, আমার সকল যাত্রাই আসলে ফিরে আসার জন্য...

জ্ঞাতব্য : 'সেলজুক-ইতিহাস : সম্পাদকীয় ও বিবিধীয়' শীর্ষক রচনাটির বানানরীতি সম্পাদকের স্বেচ্ছাকৃত। বইয়ের বানানরীতির সাথে এর যোগাযোগ নেই। বইয়ের বানান মুহাম্মদ পাবলিকেশনের গৃহীত বানানের অনুকূল।

—নেসারুদ্দীন রুম্মান
nesaruddinrumman207@gmail.com

সূচিপত্র

সেলজুক সাম্রাজ্যের ইতিহাস

প্রথম খণ্ড

ভূমিকা-৩৫

জাগৃতির আন্দোলনে অগ্রসরতার গুরুত্ব ৫৫
অনুসারীদের সতেজ করতে দ্বীনি চেতনার প্রয়োজনীয়তা ৫৬
অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুর ষড়যন্ত্র মোকাবেলায় ঐক্যের গুরুত্ব ৫৮

প্রথম অধ্যায়

সেলজুক রাজবংশ, তাদের উৎস এবং সুলতানগণ-৬১

প্রথম পরিচ্ছেদ

সেলজুকদের উৎস, বসতি এবং উদ্ভবকাল-৬৩

এক. ইসলামি বিশ্বের সাথে তুর্কিদের সংযোগ ৬৪
দুই. সেলজুক রাজবংশের আত্মপ্রকাশ ৬৫
তিন. সেলজুকদের আবির্ভাবের আগে ইসলামি প্রাচ্যের অবস্থা ৬৭
[ক] সামানীয় সম্প্রদায় (২০৪-৩৯৫ হি.) ৬৭
সামানীয় সাম্রাজ্যের অবসান ৭১
২. গজনভি সম্প্রদায় (৩৫১-৫৮২ হি.) ৭২
১. মাহমুদ গজনভি ৭৪
গজনভি-সেলজুক সংঘাত ৭৭
দান্দাকানের যুদ্ধ এবং সেলজুকদের উত্থান ৭৮
দান্দাকান যুদ্ধের ফলাফল ৭৯

৩. কারাখানি (৩৪৯-৫৩৬ হি.) ৮২
৪. বুওয়াইহিয়্যা সম্প্রদায় (৩৩৪-৪৪৭ হি.) ৮৩
৫. তুঘরিল বেগের নেতৃত্বে সেলজুকদের ঐক্য গঠন এবং সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সাধন ৮৩
৮৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

খেলাফতের সাথে সেলজুকদের সম্পর্ক, ইরাক প্রবেশ এবং বাতেনি-রাফেজি-শিয়া মতাদর্শ প্রচার নির্মূল-১০৭

এক. ইরাকে উবাইদি-ফাতেমিদের কর্তৃত্ব ও বাসাসিরির ফিতনা ১০৯
ইরাকে ফাতেমীয় উবাইদিদের কর্তৃৎব ১০৯
বাতেনিদের আকিদা ও কারামিতাদের সঙ্গে সম্পর্ক ১১০
বাতেনি সম্প্রদায়ের ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের অভিমত ১১৩
দুই. ফাতেমি-উবাইদি ধর্মপ্রচারক আল-মুয়াইয়াদ ফিদ দ্বীন হিবাতুল্লাহ আশ-শিরাজি ১১৬
মুয়াইয়াদ শিরাজির ঘটনা থেকে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও তথ্য ১২০
তিন. ৪৫০ হিজরিতে ইরাকে বাসাসিরির ফিতনা ১২০
বাসাসিরি ও মুয়াইয়াদ হিবাতুল্লাহর মাঝে যোগাযোগ ১২২
বাসাসিরির ফিতনা জোরদারকরণে হিবাতুল্লাহ শিরাজির প্রচেষ্টাসমূহ ১২৩
শিক্ষা ১২৫
বাসাসিরির বাগদাদ দখল এবং ফাতেমিদের নামে খুতবা পাঠ ১২৬
রইসুর রুয়াসা আবুল কাসেম ইবনু মাসলামাকে হত্যা এবং বাগদাদবাসীর থেকে প্রতিশোধ ১২৭
উজির আবুল কাসেম রাহিমাহুল্লাহ ১২৯
খলিফা কায়েম বি-আমরিল্লাহ : তার ইবাদত এবং কাবা শরিফের দরজায় ঝুলিয়ে-রাখা সে ঐতিহাসিক দুআ ১২৯
কাবা শরিফে ঝুলন্ত দুআ ১৩১
বন্দিখানা থেকে তুঘরিল বেগের নিকট খলিফা কায়েম বি-আমরিল্লাহ'র পত্র ১৩৩
তুঘরিল বেগের বাগদাদ আগমন এবং খলিফার সঙ্গে সাক্ষাৎ ১৩৫
বাসাসিরিকে হত্যা ১৩৭
ফাতেমি-উবাইদি মতাদর্শের বিরুদ্ধে সেলজুকদের যুদ্ধ ১৩৮
রোমের সাথে সেলজুকদের সংঘাত ১৪০
শাহজাদিকে তুঘরিল বেগের বিয়ের প্রস্তাব, বিয়ে এবং ইন্তেকাল ১৪০
খলিফা-কন্যার সাথে তুঘরিল বেগের সাক্ষাৎ এবং ইন্তেকাল ১৪২
প্রথম সেলজুক উজির আমিদুল মুলক আল-কিনদারি ১৪৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সুলতান আলপ আরসালান (মুহাম্মদ) বীরকেশরী বা বীরসিংহ-১৪৭

এক. সুলতানের কথায় সবার ঐকমত্য ১৪৮
দুই. তুঘরিল বেগের স্ত্রী ও খলিফা-কন্যাকে বাগদাদে ফিরে আসার ব্যাপারে আলপ আরসালানের অনুমতি প্রদান ১৪৮
তিন. আল্লাহর পথে সুলতান আলপ আরসালানের জিহাদ ১৪৯
আলোচনার শিক্ষা ১৫১
চার. সুলতান আলপ আরসালানের শাম আক্রমণ ও আলেপ্পো দখল ১৫২
১. আলেপ্পো অবরোধ এবং সেলজুক সাম্রাজ্যের কাছে সন্ধিমূলক নতি স্বীকার ১৫৪
২. আলেপ্পোর গভর্নর মাহমুদ ইবনু নাসরের সন্ধির পদক্ষেপ ১৫৬
৩. শামের দক্ষিনাঞ্চলে সেলজুক অভিযান ১৫৭
পাঁচ. ৪৬৩ হিজরিতে সংঘটিত মালাজগির্দের যুদ্ধ ১৫৯
১. ইসলামের বিরুদ্ধে রোম সম্রাটের ষড়যন্ত্র ১৬০
২. রোমান রাজার কাছে সুলতান আলপ আরসালানের সন্ধি-প্রস্তাব প্রেরণ ১৬১
৩. যুদ্ধের সূত্রপাত এবং মুসলিমদের বিজয় ১৬২
৪. হিজরি ৪৬৩ সনে সংঘটিত মালাজগির্দ যুদ্ধের ফলাফল ১৬৩
আলোচনা থেকে অর্জিত শিক্ষা এবং উপদেশসমূহ ১৬৭
সিংহপুরুষ সুলতান আলপ আরসলানের মৃত্যু ১৬৮

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সুলতান মালিকশাহ-১০৭

এক. রাজত্ব পরিচালনার জন্য মালিকশাহকে প্রস্তুত ও রাজত্ব সুদৃঢ়করণ ১৭০
১. রাজত্ব পরিচালনার জন্য তৈরিকরণ ১৭০
২. ক্ষমতা লাভ ১৭১
৩. চাচার বিদ্রোহ দমন ১৭২
দুই. জনসাধারণকে গুরুত্ব প্রদান এবং ন্যায়-ইনসাফের কিছু নমুনা ১৭৫
১. জনসাধারণের খোঁজখবর ১৭৫
২. হাজিদের কাফেলার বিদায়ি অভ্যর্থনা ১৭৫
৩. তিনি ছিলেন মজলুমের রক্ষাকবচ ১৭৬
৪. রবের দরবারে অকৃত্রিম প্রার্থনা ১৭৬

৫. মুসলমিদদের সাথে বুদ্ধিদীপ্ত আচরণ ও সংশোধন ১৭৭
৬. এক ওয়ায়েজের সঙ্গে সুলতানের চমৎকার ঘটনা ১৭৭
৭. ন্যায়বিচারে নিরাপস সুলতান ১৭৮
৮. সম্পদ তো আল্লাহর আর মানুষ তো তারই বান্দা ১৭৯
৯. খাশইয়াতে ইলাল্লাহ'র দোহাই ১৭৯
১০. সুলতানের ও সালতানাতের রহস্যময় নৈশবাহিনী ১৭৯
১১. খলিফা আল-মুকতাদি ও মালিকশাহ'র কন্যার বিয়ে ১৮১
১২. সুলতান-কন্যার বিয়ের উপঢৌকন ও শ্বশুরালয়ে প্রেরণ ১৮১
শামে সেলজুকদের স্থিতি ১৮২
১. দামেশকে প্রভাব বিস্তার ১৮৩
২. আলেপ্পোতে মিরদাসি নেতৃত্বের মূলোৎপাটন ও উকাইলিদের গোড়াপত্তন ১৮৫
৩. শামে মুসলিম ও তুতুশের মধ্যকার সম্পর্ক ১৮৭
৪. মুসলিম ইবনু কুরাইশের দামেশক আক্রমণ ১৮৮
৫. শারাফুদ্দৌলা মুসলিম ইবনু উকাইলির হত্যাকাণ্ড ১৮৯
৬. তুতুশ ও সুলাইমান ইবনু কুতালমিশের বিরোধ ১৯০
৭. সুলতান মালিকশাহ'র আলেপ্পো অধিকার ১৯২
চার. রোমের সেলজুক সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা (৪৭০-৭৯ হি.) ১৯৩
পাঁচ : হাসান ইবনুস সাব্বাহ এবং নিজারি ইসমাইলি (হাশিশি) দাওয়াহ কার্যক্রম ১৯৫
১. আলামুত দুর্গ দখল ১৯৬
২. নিজারি-বাতেনি দাওয়াতের সদস্যদের পদ ও স্তর ১৯৭
৩. নিজারি দাঈর দায়িত্ব ও কর্তব্য ১৯৯
৪. দাওয়াতের স্তর ২০১
নিজারি দাওয়াতের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কৌশল ও স্তর ২০১
৫. বাতেনি আন্দোলনের অগ্রযাত্রা ২০৩
বাতেনিদের নির্বাচিত পথ ও পন্থা ২০৩
বাতেনি দাঈদের অনুসরণীয় তিনটি ধাপ ২০৪
আরও যারা গ্রহণ করেছিল বাতেনিদের দাওয়াত ২০৬
৬. বাতেনি সম্প্রদায়ের অপকৌশল ২০৯
৭. হাসান আস-সাব্বাহ'র প্রতি জালালুদ্দিন মালিকশাহ'র চিঠি ২১২
৮. মালিকশাহ'র প্রতি হাসান আস-সাব্বাহ'র জবাবি চিঠি ২১৫
৯. ইরানের ইসমাইলি সাম্রাজ্য ২২৩
১০. নিজামুল মুলক ও বাতেনি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তার প্রতিরোধ পরিকল্পনা ২২৪

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

খলিফা আল-কায়েম বি-আমরিল্লাহ'র মৃত্যুবরণ এবং আল-মুকতাদি বিল্লাহ'র খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ-২২৬

এক. খলিফা আল-কায়েম বি-আমরিল্লাহ'র মৃত্যু ২২৬
দুই. আল-মুকতাদি বিল্লাহ'র খেলাফত ২২৭
তিন. মালিকশাহ ও আল-মুকতাদির মাঝে সম্পর্কের অবনতি ২২৯
চার. নিজামুল মুলক ২৩১
১. সাম্রাজ্যের সার্বিক ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ ২৩২
২. নিজামুল মুলকের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের তাত্ত্বিক রূপ ২৩৩
৩. প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়ে গুরুত্বারোপ ২৩৫
৪. নিজামুল মুলক ও তার অর্থনীতি ভাবনা ২৩৭
৫. নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধিতে গুরুত্বারোপ ২৩৮
৬. ইলম তথা জ্ঞানচর্চা ও সাহিত্যের বিকাশে নিজামুল মুলক ২৩৯
৭. নিজামুল মুলকের ইবাদত ও বিনয়ের কিছু চিত্র ২৪০
নিজামুল মুলকের কিছু কবিতা ২৪২
৮. নিজামুল মুলকের ওফাত ২৪৩

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সেলজুক সাম্রাজ্যের অবক্ষয়, ভাঙন ও পতনের ক্রান্তিকাল-২৪৬

এক. মাহমুদ ইবনু মালিকশাহকে সুলতান হিসেবে আব্বাসি খলিফার স্বীকৃতি ২৪৭
১. সিংহাসন নিয়ে বারকিয়ারুক ও তুরকান খাতুনের যুদ্ধ ২৪৯
২. মাহমুদ ইবনু মালিকশাহ'র ওফাত ২৫০
দুই. বারকিয়ারুকের বিজয় এবং সুলতান হিসেবে খলিফার স্বীকৃতি ২৫০
১. সিংহাসন নিয়ে বারকিয়ারুক ও চাচা তুতুশের দ্বন্দ্ব ২৫১
২. ক্ষমতা নিয়ে আরসালান আরগুন এবং বারকিয়ারুকের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ২৫৩
তিন. বারকিয়ারুক, মুহাম্মদ ও সানজার : তিন ভাইয়ের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ২৫৪
সন্ধির নীতি ও শর্তাবলি : ২৫৫
চার. বারকিয়ারুকের মৃত্যু এবং মুহাম্মদ ইবনু মালিকশাহ'র ক্ষমতাগ্রহণ ২৫৬
১. জুমার খুতবায় সুলতানের উপস্থিতিতে মর্মস্পর্শী ভীতিসঞ্চারক উপদেশ ২৫৮
২. মুহাম্মদ ইবনু মালিকশাহকে ইমাম গাজালি রাহিমাহুল্লাহর উপদেশ ২৬৩

৩. বাতেনিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ২৬৭
বাতেনিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায় ২৬৯
ইসমাইলি-বাতেনিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ : অবৈধ প্রমাণের চেষ্টা ২৭১
বাতেনিদের বিরুদ্ধে আবার যুদ্ধ ২৭২
৪. সুলতান মুহাম্মদ ইবনু মালিকশাহ'র মৃত্যু ২৭৩
পাঁচ. আব্বাসি খলিফা মুসতাজহির বিল্লাহ ২৭৪
১. তারাবি নামাজ ও কুরআনের প্রতি মুসতাজহিরের গুরুত্ব প্রদান ২৭৬
২. মুসতাজহিরের কিছু বাণী ২৭৭
৩. মুসতাজহির সম্পর্কে ইমাম গাজালির অভিমত ২৭৭
৪. মুরাবিতদের সাথে মুসতাজহিরের সম্পর্ক ২৭৮
৫. ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে খলিফা মুসতাজহির বিল্লাহ'র অবস্থান ২৮১
৬. সেলজুকদের সাথে খলিফা মুসতাজহির বিল্লাহ'র সম্পর্ক ২৮১
৭. মুসতাজহির বিল্লাহ'র মৃত্যু ২৮২
ছয়. সানজার ও সেলজুক সালতানাত ২৮৩
১. সেলজুক সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্থানে সানজারের প্রভাব বিস্তার ২৮৫
২. মুহাম্মদ ইবনু মালিকশাহ'র দুই পুত্র মাহমুদ ও মাসউদের দ্বন্দ্ব ২৮৬
৩. আব্বাসি-সেলজুকি দ্বন্দ্বের আনুষ্ঠানিক সূচনা ২৮৭
৪. খলিফা মুসতারশিদ বিল্লাহ ও সুলতান মাহমুদের মাঝে সম্পর্কের টানাপোড়েন ২৮৭
৫. ইমাদুদ্দিন জিনকি ও খলিফার এক বিশিষ্ট প্রতিনিধির সংঘর্ষ ২৮৮
৬. ভ্রাতুষ্পুত্র মাহমুদের ব্যাপারে সুলতান সানজারের প্রজ্ঞার প্রতিফলন ২৮৯
৭. সুলতান মাসউদ ইবনু মুহাম্মদ ২৯০
৮. সুলতান মাসউদের ওফাত ২৯২
সাত. খলিফা মুসতারশিদ বিল্লাহ আব্বাসি ২৯৩
১. বাইআত গ্রহণ ২৯৪
২. খলিফার গুণাবলি এবং কাব্যপ্রতিভা ২৯৪
৩. খেলাফতের সার্বজনীন প্রভাব বিস্তারে খলিফা মুসতারশিদ বিল্লাহ'র প্রচেষ্টা ২৯৬
৪. খলিফা মুসতারশিদ বিল্লাহ'র মসুল অবরোধ ২৯৬
৫. খলিফা মুসতারশিদ ও সুলতান মাসউদের যুদ্ধ : খলিফার গ্রেফতারি এবং হত্যা ২৯৭
আট. খলিফা রাশেদ বিল্লাহ ৩০০
১. সুলতান মাসউদ এবং খলিফা রাশেদের মাঝে বিরোধ ৩০০
২. খলিফা রাশেদ বিল্লাহকে অপসারণ ৩০১

৩. সুলতান মাসউদের খলিফা রাশেদ বিল্লাহ'র পিছু ধাওয়া ৩০২
৪. খলিফা রাশেদ বিল্লাহকে হত্যা ৩০২
নয়. খেলাফতের উপর সেলজুকদের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ ৩০৪
১. বাগদাদের বাইরে প্রশাসনিক দফতর স্থানান্তর ৩০৪
২. সেলজুক-পরিবারের সাথে আব্বাসি খলিফাদের বিবাহ বন্ধন ৩০৫
৩. ক্ষমতা হস্তান্তর ৩০৫
৪. যুবরাজ নিয়োগ ৩০৬
৫. খেলাফতের প্রতীক ৩০৭
৬. সুলতানদের উপাধি ৩০৮
৭. সেনাবাহিনী পুনর্গঠন ৩০৯
৮. আব্বাসি খেলাফতের পুনরুত্থানের সূচনা ৩১৪
দশ. সেলজুক সালতানাতের অবসান ৩১৬

দ্বিতীয় অধ্যায়
সেলজুক শাসনামলে আব্বাসিদের মন্ত্রিত্ব-ব্যবস্থা-৩২১

প্রথম পরিচ্ছেদ
আব্বাসি খলিফা ও সেলজুক সুলতানের উজিরের গুণাবলি-৩২৫

এক. আব্বাসি খলিফার উজিরের গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ ৩২৫
দুই. সেলজুক উজিরের গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ ৩৩১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
আব্বাসি এবং সেলজুকি উজিরের বিশেষত্ব, বৈশিষ্ট্য, প্রথা, নিয়োগদান এবং উপাধি-৩৩৬

এক. আব্বাসি উজির নিয়োগদানের প্রথা ৩৩৬
দুই. সেলজুক উজির নিয়োগের রীতি ৩৩৮
তিন. আব্বসি উজিরদের উপাধিসমূহ ৩৩৯
চার. সেলজুক উজিরের উপাধিসমূহ ৩৪১
পাঁচ. আব্বাসি উজিরের বৈশিষ্ট্য ও ব্যাজ ৩৪২
ছয়. সেলজুক উজিরের সুবিধাদি ও ব্যাজ ৩৪৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আব্বাসি ও সেলজুক উজিরের যোগ্যতা-৩৪৭

ক. আব্বাসি উজিরের যোগ্যতা ও ক্ষমতা ৩৪৭
দুই. সেলজুক উজিরের ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্য ৩৫৩

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আব্বাসি ও সেলজুক উজিরদের অপসারণ এবং সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণ-৩৫৮

এক. আব্বাসি বংশের উজিরদের অপসারণ ও সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণ ৩৫৮
দুই. সেলজুক উজিরদের অপসারণ ও বাজেয়াপ্তকরণ ৩৬১
তিন. আব্বাসি মন্ত্রিত্ব-পদ লাভে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং দর-কষাকষি ৩৬২
চার. সেলজুক মন্ত্রিত্ব-পদ লাভে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং দর-কষাকষি ৩৬৩

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আব্বাসি খলিফাগণ এবং সেলজুকদের প্রখ্যাত উজিরবর্গ-৩৬৮

এক. আব্বাসি খলিফাদের প্রখ্যাত উজিরগণ ৩৬৮
১. ফখরুদ্দৌলা ইবনু জুহাইর ৩৬৮
২. আমিদুদ্দৌলা ইবনু জুহাইর ৩৭০
৩. আবু শুজা মুহাম্মদ ইবনু হুসাইন আর-রুজারাওয়ারি ৩৭২
৪. হাসান ইবনু আলি ইবনু সাদাকাহ ৩৭৬
৫. আবুল কাসেম শারাফুদ্দিন আলি ইবনু তররাদ জাইনাবি ৩৭৮
৬. আউনুদ্দিন ইবনু হুবাইরা ৩৭৯
দুই. সেলজুক সালতানাতের বিখ্যাত উজিরগণ ৩৮২
১. নাসির উদ্দিন আবুল মাহাসিন সাদ আল-আবি ৩৮২
২. কামালুল মুলক সামিরমি ৩৮৩
৩. কামালুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনু হুসাইন আল-খাজিন ৩৮৪

তৃতীয় অধ্যায়
সেলজুকদের যুদ্ধনীতি-৩৮৭

প্রথম পরিচ্ছেদ

সেলজুকদের সামরিক প্রশাসন-কাঠামো-৩৮৯

সেলজুকদের সামরিক প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ভিত্তি ৩৮৯
এক. সেলজুকদের সামরিক চিন্তার উপাদানসমূহ ৩৮৯
সমরে সাফল্য লাভের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পথ-পন্থা ৩৯১
১. শিশুদের সামরিক প্রশিক্ষণ ৩৯১
২. জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ ৩৯২
৩. সেনাবাহিনী ও সেনাপতিদের ঘনিষ্ঠতা অর্জনে আগ্রহী হওয়া ৩৯৪
৪. অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা ৩৯৫
৫. আন্তরিকতা এবং ত্যাগ ৩৯৭
৬. সতর্কতা, সাবধানতা এবং অনুসরণ ৩৯৭
৭. সেনাবাহিনী ও নেতাদের মাঝে সম্পর্ক এবং সামরিক পদে ক্রমোন্নতি ৩৯৮
৮. মতামত, পরিকল্পনা এবং সামরিক শক্তির সুসমন্বয় ৩৯৯
দুই. বিভিন্ন জাতি-গোত্রের উপর নির্ভরতা ৪০১
তিন. সামরিক দলগুলোর সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধিকরণ ৪০২
চার. দশমিক বিভক্তি ৪০৩
পাঁচ. সামরিক জায়গির ৪০৫
সেলজুকদের নিকট জমিদারির বৈশিষ্ট্যসমূহ ৪০৭
সামরিক জমিদারি বিস্তৃতির কারণসমূহ ৪০৮
জমিদারি সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের অবস্থান ৪০৯
ছয়. পণবন্দি বা বন্ধক ৪১০
সাত. সেনাবাহিনীর মানসিক প্রস্তুতি ৪১১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সেলজুকদের সামরিক-প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা-৪১৩

এক. নেতৃত্বের স্তরসমূহ ৪১৩
দুই. সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজ বিভাগ ৪২২
তিন. সেলজুক সেনাবাহিনীর বিভাগসমূহ ৪২৬
চার. সেনাবাহিনীর সমন্বিত শক্তির উৎস ৪৩১
পাঁচ. সেনাবাহিনীর বিভাগসমূহ ৪৩২

ছয়. সামরিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ৪৩৪
সাত. সেলজুক সেনাবাহিনীর সদস্যসংখ্যা ৪৩৫
আট. গোয়েন্দা এবং গুপ্তচর ৪৩৬
নয়. সামরিক সহায়তা ৪৩৭
দশ. চিকিৎসা সহায়তা ৪৪০
এগারো. সেলজুক সেনাবাহিনীতে ঘোড়ার ভূমিকা ৪৪১
বারো. সেলজুক সেনাবাহিনীর অর্থের উৎস ৪৪২
তেরো. সেলজুকদের নিদর্শন ও পতাকা ৪৪৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সমরাস্ত্র ও সামরিক সুরক্ষা-৪৪৪

এক. হালকা ব্যক্তিগত হাতিয়ার ৪৪৪
দুই. সম্মিলিত ভারী অস্ত্র ৪৪৫
তিন. প্রদর্শনী ও সৌন্দর্যের হাতিয়ার ৪৪৬
চার. নগর রক্ষা নীতি ৪৪৭
পাঁচ. অবরোধ মাধ্যম ৪৪৭
ছয়. অস্ত্র তৈরি ও সংরক্ষণাগার (অস্ত্রগুদাম) ৪৪৭

৪র্থ পরিচ্ছেদ

পরিকল্পনা ও যুদ্ধকৌশল-৪৪৬

এক. দ্রুত পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হওয়া ৪৪৮
দুই. তির নিক্ষেপণ ৪৫২
তিন. শত্রু বাহিনীর সাথে মুখোমুখি সংঘাত ৪৫৩
চার. নিষ্কাশন অভিযান ৪৫৪
পাঁচ. ভস্মীভূত ভূ-রাজনীতি ৪৫৫
ছয়. শত্রুসৈন্যের উপর প্রভাব বিস্তার ৪৫৫
সাত. সড়ক নিয়ন্ত্রণ ৪৫৬
আট. পানির উৎস নিয়ন্ত্রণ ৪৫৭
নয়. সামরিক নিরাপত্তা ৪৫৭
দশ. বিশেষ জরুরি মিশন ৪৫৮
এগারো. তালিকাভুক্তি ৪৬০

৫ম পরিচ্ছেদ

জিনকি, আইয়ুবি ও মামলুক সাম্রাজ্যে সেলজুক নীতির প্রভাব-৪৬১

এক. জিনকি সাম্রাজ্য ৪৬১
দুই. আইয়ুবি ও মামলুক সাম্রাজ্য ৪৬২

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সেলজুক আমলে নারীদের অবস্থান-৪৬৯

এক. তুঘরিল বেগের স্ত্রী ৪৭০
দুই. সুলতান মালিকশাহ'র স্ত্রী তুরকান খাতুন ৪৭১
তিন. খলিফা মুসতাজহির বিল্লাহ'র স্ত্রী, মালিক শাহ'র কন্যা খাতুন দ্বিতীয়া ৪৭২
চার. মুকতাদি বিল্লাহ'র স্ত্রী কহরামানা ৪৭৪
পাঁচ. খাতুন আস-সাফারিয়্যাহ ৪৭৪
ছয়. সেলজুক শাসনামলে আলেমা, জাহেদা এবং ওয়ায়েজা হিসেবে প্রসিদ্ধ কয়েকজন নারী ৪৭৫
দুনিয়াবিমুখতা ও ইবাদতের ক্ষেত্রে বাগদাদের প্রসিদ্ধ নারীগণ ৪৭৫
সাত. নারী-পুরুষ অবাধ মেলামেশা ৪৭৬

সেলজুক সাম্রাজ্যের
ইতিহাস
[প্রথম খণ্ড]

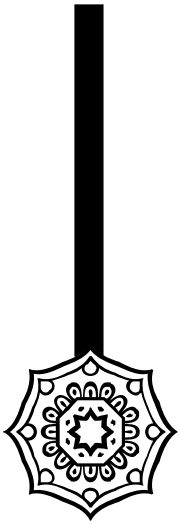

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি আর তাঁর কাছেই ক্ষমা চাই। আমরা নিজেদের ক্ষতি এবং যাবতীয় কর্মকাণ্ডের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছেই আশ্রয় কামনা করি। তিনি যাকে সঠিক পথ দেখান, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর যাকে তিনি বিপথগামী করে রাখেন, তাকে সঠিক পথ প্রদর্শনের কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি—আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; তিনি এক ও একক। তাঁর কোনো অংশীদার ও সমকক্ষ নেই। আমি এও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—

> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ .
>
> হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় করো; আর মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না (আমৃত্যু ইসলামের উপর অবিচল থেকো)। [সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১০২]

তিনি আরও বলেন—

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا .

হে ঈমানদারগণ, তোমরা ভয় করো তোমাদের রবকে, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একই সত্তা হতে; তা হতে সৃষ্টি করেছেন বহু পুরুষ ও নারী। ভয় করো সে সত্তাকে, যাঁর উসিলা দিয়ে তোমরা পরস্পর আবেদন-নিবেদন করো; আর সতর্ক থেকো আত্মীয়তার সম্পর্কের ব্যাপারে। নিশ্চয় মহান আল্লাহ (সর্বক্ষণ) তোমাদের পর্যবেক্ষণ করেন। [সুরা নিসা, আয়াত : ০১]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا .

হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো আর সঠিক কথা বলো। মহান আল্লাহ বিশুদ্ধভাবে তোমাদের কর্মসমূহের ব্যবস্থাপনা করে দেবেন আর ক্ষমা করবেন তোমাদের গুনাহসমূহ। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে মহা সফলকাম। [সুরা আহজাব, আয়াত : ৭০-৭১]

হে মহান প্রভু, সকল প্রশংসা আপনারই—এ আপনার মহান সত্তা ও অন্তহীন রাজত্বের শানসুলভ এক বিষয়। আপনার জন্যই সকল প্রশংসা—আপনার সন্তুষ্টি অবধি, সন্তুষ্টিকালে এবং সন্তুষ্টিপরবর্তী সময়কালেও। সতত সকল প্রশংসা আপনার জন্যই বরাদ্দ আর এ বিষয় আপনার সুউচ্চ মর্যাদার সাথেই সঙ্গতিপূর্ণ। আপনার জন্যই সকল স্তুতি, হে আল্লাহ—এ কেবল আপনারই বড়ত্বের উপযোগী। সকল মর্যাদাও আপনারই জন্য, এ আপনার শ্রেষ্ঠত্ব ও বড়ত্বের দাবি।

❁❁❁

পরকথা। ইতিপূর্বে নববি যুগ ও খিলাফতে রাশেদা নিয়ে যেসব গ্রন্থ রচিত হয়েছে, এ গ্রন্থটি সে সূত্রে সম্পৃক্ত এবং এটি সে ধারাবাহিকতারই একটি সংযোজন। ইতিমধ্যে যে কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলো হলো—

- ❖ আস-সিরাতুন নববিয়্যাহ
- ❖ আবু বকর সিদ্দিক
- ❖ উমর ইবনুল খাত্তাব
- ❖ উসমান ইবনু আফফান
- ❖ আলি ইবনু আবি তালিব
- ❖ হাসান ইবনু আলি
- ❖ আদ-দাউলাতুল উমাভিয়্যাহ বা উমাইয়া সাম্রাজ্য

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটির নাম *দাউলাতুস সালাজিকাহ ওয়া বুরুজু মাশরুইন ইসলামিয়্যিন লি-মুকাওয়ামাতিত তাগালগুলিল বাতিনি ওয়াল গাজবিস সালিবি* (সেলজুক সাম্রাজ্য : বাতেনি গোষ্ঠীর অনুপ্রবেশ ও ক্রুসেড যুদ্ধ মোকাবেলায় একটি নতুন ইসলামি মিশনের অভ্যুদয়)। এটিকে মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস ও ক্রুসেড যুদ্ধসমূহের ধারাবাহিকতায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট ও অধ্যায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

মহান আল্লাহর আসমাউল হুসনা (সুন্দর সুন্দর নাম) ও সুউচ্চ গুণাবলিসমূহের উসিলায় তাঁর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন এ গ্রন্থটিকে একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে সম্পন্ন করার তাওফিক আমাকে দান করেন; তিনি যেন এ সিরিজের প্রতিটি গ্রন্থে তাঁর পক্ষ হতে অফুরান বরকত ও কবুলিয়ত দান করেন।

এ গ্রন্থটিতে আলোচনা থাকবে :—সেলজুক সম্প্রদায়ের পরিচিতি, বংশ-পরিক্রমা, সুলতানগণ এবং তাদের জন্মভূমি ও উত্থান সম্পর্কে; পাশাপাশি ইসলামি সাম্রাজ্যের সাথে তুর্কিদের সম্পর্ক নিয়েও হবে আলাপ; আলোচনা হবে সেলজুকদের উত্থানের পূর্বে ইসলামি প্রাচ্যের অবস্থা নিয়েও।

সামানি ও গজনভি সাম্রাজ্য এবং গজনভি-সেলজুকি দ্বন্দ্ব-সংঘাত সম্পর্কিত আলোচনাও বিবৃত থাকবে। দান্দাকানের যুদ্ধ, সেলজুক সালতানাতের প্রতিষ্ঠা, কারাখানি সাম্রাজ্য, বুওয়াইহি রাজবংশ ও তাদের শিয়া মতবাদ গ্রহণ এবং বুওয়াইহি কর্তৃক আব্বাসি খলিফাদের সাথে অবমাননাকর আচরণ, কারামিতাদের সাথে বুওয়াইহিদের আঁতাত, ইসলামি সাম্রাজ্যের সীমান্ত সংরক্ষণের ব্যাপারে বুওয়াইহিদের

অবস্থান এবং শিয়া-আন্দোলনের প্রতি তাদের সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টা বিষয়েও থাকবে ধারাবাহিক বিবরণ।

আরও উল্লেখ থাকবে—কীভাবে বুওয়াইহি শিয়ারা মুসলিম সাম্রাজ্যে বিভক্তির উস্কানি ছড়িয়ে দিয়েছিল, কীভাবে তারা তুলেছিল সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের স্লোগান! বুওয়াইহি সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় বিশেষায়িত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও রচনাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, ইখওয়ানুস সাফার মতো বিকৃত দার্শনিক চিন্তাধারার প্রসার এবং বুওয়াইহি সাম্রাজ্যের অবসান—এসব বিষয়েও থাকবে অল্প-বিস্তর আলোচনা।

তুঘরিল বেগের নেতৃত্বে সেলজুকদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া, সেলজুকদের সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ এবং আব্বাসি খলিফা কর্তৃক সেলজুকদের স্বীকৃতি প্রদান সম্পর্কিত আলোচনাও এ গ্রন্থে স্থান পাবে।

আরও থাকবে—ইরাকে ফাতেমি-উবাইদি কর্তৃত্ব, উবাইদি-ফাতেমি সাম্রাজ্যের আকিদা এবং কারামিতাদের সাথে তাদের সম্পর্ক, বাসাসিরির ফিতনা, বাতেনি মতবাদসমূহের ব্যাপারে আলেমদের অবস্থান, ইরাক ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় বাতেনি চিন্তাধারার প্রচারে হিবাতুল্লাহ শিরাজির তৎপরতা, আব্বাসি খেলাফত ধ্বংসের অভিপ্রায়ে বাসাসিরি সেনাপ্রধানের নেতৃত্বে সৃষ্ট বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি হিবাতুল্লাহর সহযোগিতার বর্ণনা; থাকবে—ইরাককে ফাতেমি-উবাইদি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্তকরণ, বাগদাদে বাসাসিরিদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং তাতে ফাতেমিদের সম্মানে খুতবা পাঠের রীতি প্রতিষ্ঠার বিবরণীও।

আব্বাসি খলিফা কায়েম বি-আমরিল্লাহ'র পক্ষ হতে সেলজুক সুলতান তুঘরিল বেগের প্রতি পত্র প্রেরণ এবং খলিফার আহ্বানে তুঘরিল বেগের সাড়া প্রদান, বাসাসিরি হত্যা, সেলজুকদের দ্বারা ফাতেমি-উবাইদি মিশনের মোকাবেলা, তুঘরিল বেগের শাসনামলে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য সম্পর্কে সেলজুক সাম্রাজ্যের অবস্থান, সেলজুক সালতানাতের খেদমতে সেলজুক উজির আমিদুল মুলক আল-কিনদারির প্রচেষ্টা ও কর্মতৎপরতা সম্পর্কেও আলোচনা থাকবে।

এই গ্রন্থে আরও সন্নিবেশিত হয়েছে—(তুঘরিল বেগের পরে সালতানাতের দায়িত্ব-গ্রহণ-করা) মহান সেলজুক সুলতান আলপ আরসালানের জীবনচরিত, আল্লাহর পথে আলপ আরসালানের জিহাদ, শাম আক্রমণ, আলেপ্পো সেলজুক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্তিকরণ, রোমের বিরুদ্ধে ৪৬৩ হিজরির মালাজগির্দের যুদ্ধে সুলতানের বিশাল ও প্রসিদ্ধ জয়, রোম সম্রাটের গ্রেফতার এবং যুদ্ধের ফলাফল-বিষয়ক আলোচনা।

এতে রয়েছে—সুলতান আলপ আরসালানের ওফাত, পুত্র মালিকশাহ'র ক্ষমতাগ্রহণ, সুলতান মালিকশাহ'র বিস্তারিত জীবনকথা, হাসান আস-সাব্বাহ'র জীবনী, নিজারি-

ইসমাইলি-হাশিশি মিশন, আলামুত দুর্গে তাদের প্রভাব বিস্তার, নিজারি-বাতেনি দাওয়াতি মিশনের বিভিন্ন স্তর ও পদ—এ মিশনের দাঈদের কর্মসূচি, তাদের কাছে দাওয়াতের বিভিন্ন স্তর, বাতেনি আন্দোলনসমূহের সূচনা, গণমানুষকে প্রতারিত করতে তাদের কৌশল, হাসান আস-সাব্বাহ ও সুলতান মালিকশাহ'র মধ্যকার পত্র-যোগাযোগ ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা।

এ গ্রন্থে ইরানের ইসমাইলি সাম্রাজ্য সম্পর্কেও সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হবে; আলোচনা করা হবে—আব্বাসি খলিফা কায়েম বি-আমরিল্লাহ ও পুত্র মুকতাদি বিল্লাহ'র খেলাফতের দায়িত্বগ্রহণ, মালিকশাহ ও মুকতাদি বি-আমরিল্লাহ'র সম্পর্কের টানাপোড়েন ইত্যাদি বিষয়েও।

এ গ্রন্থে বিশদ করা হবে সেলজুক উজির নিজামুল মুলক প্রতিষ্ঠিত 'সুন্নি প্রকল্প' সম্পর্কে, সুলতান আলপ আরসালান ও মালিকশাহ'র আমলে যেটি সম্পন্ন হয়েছিল। এ মহান রাজনীতিবিদের জীবনী বিস্তারিত আলোচনা করা হবে; রাষ্ট্রপরিচালনা এবং এ বিষয়ে তার সুগভীর পরিকল্পনা, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্থাসমূহের ব্যবস্থাপনা, অর্থনৈতিক বিস্তৃতি, নগরকেন্দ্রিক স্থাপনা, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে তার ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে।

উজির নিজামুল মুলকের ইবাদত-বন্দেগি, বিনয় ও নম্রতা, তার প্রতি কবিদের প্রশংসাসূচক অভিব্যক্তি ও উচ্চারণ, তার মৃত্যুতে বাগদাদবাসী ও মুসলিমদের আবেগ-অনুভূতি এবং কবি-শায়েরদের শোকগাথা রচনার ইতিহাসও এ গ্রন্থ জানাবে।

বিখ্যাত কবি মুকাতিল ইবনু আতিয়্যাহ নিজামুল মুলক সম্পর্কে বলেন—

كان الوزير نظام الـملك لؤلؤة + يتيمة صاغها الرحـمن من شرف

عزت فلم تعرف الأيام قيمتها + فردها غيرة منه إلى الصدف

উজির নিজামুল মুলক এক অনুপম মুক্তোদানা,
দয়াময় নিজ অনুগ্রহে তাকে তৈরি করেছেন;
যুগ অতি মূল্যবান এ মাণিক্যের সঠিক মূল্যায়ন করেনি,
ফলে আল্লাহ তাআলা তাকে ঝিনুকে পরিণত করে দিয়েছেন।

গ্রন্থটি পাঠককে নিয়ে যাবে সেলজুক সাম্রাজ্যের অনৈক্য, বিশৃঙ্খলা, দুর্বলতা ও পতনের ইতিহাসে। জানাবে—সুলতান মালিকশাহ'র পুত্র বারকিয়ারুক ও সৎ-মা তুরকান খাতুনের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-সংঘাত সম্পর্কে—যে তুরকান খাতুন তার সহোদর শিশুপুত্র

মাহমুদকে সালতানাতের ক্ষমতায় বসানোর জন্য বারকিয়ারুকের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন।

সেলজুক-পরিবারে সংঘটিত অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ সম্পর্কেও সবিস্তার আলোচনা থাকবে। মালিকশাহ'র পুত্র বারকিয়ারুকের মৃত্যু ও মুহাম্মদ ইবনু মালিকশাহ'র ক্ষমতাগ্রহণ এবং বাতেনিদের সাথে তার লড়াই সম্পর্কেও থাকবে বিবরণ।

বিবৃত হবে—আব্বাসি খলিফা মুসতাজহির বিল্লাহ ও সেলজুক সুলতান সানজার ইবনু মালিকশাহ'র জীবনী, সালতানাতের ক্ষমতা নিয়ে সেলজুক-পরিবারে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, সুলতান মাসউদ ইবনু মুহাম্মদ ইবনু মালিকশাহ'র জীবনকথা এবং তার সাথে আব্বাসি খলিফা মুসতারশিদ বিল্লাহ'র দ্বন্দ্ব-আখ্যান।

আব্বাসি খলিফা মুসতারশিদ বিল্লাহ সেলজুক সুলতানদের কাছ থেকে খলিফার অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার এবং খেলাফতের প্রভাব-প্রতিপত্তি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তিনি গ্রেফতার হয়ে বাতেনিদের হাতে নিহত হন। মুসতারশিদ বিল্লাহ'র পরে তার পুত্র খলিফা রাশেদ বিল্লাহ ক্ষমতাসীন হন। তবে তিনিও পরবর্তীতে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে সেলজুক সুলতান মাসউদের আমলে নিহত হন।

আব্বাসি খেলাফতে সেলজুকদের আধিপত্য বিস্তারের প্রভাব—যেমন : বাগদাদের বাইরে রাজধানী স্থানান্তর, খলিফার কর্তৃত্ব সেলজুক সুলতানের হাতে হস্তান্তর, সালতানাতের উত্তরাধিকার নির্ধারণে সেলজুকদের হস্তক্ষেপ, সেলজুকদের কর্তৃত্বকালীন সেনাবাহিনীর পুনর্গঠন থেকে আব্বাসি খেলাফতের বঞ্চিত হওয়া ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে গ্রন্থটিতে আলোচনা রয়েছে।

আব্বাসি খলিফা মুকতাফি লি-আমরিল্লাহ'র (মৃ. ৫৫৫ হি.) শাসনামলে খেলাফতে আব্বাসিয়ার উন্নয়নের সূচনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে—জিনকিদের আলোচনার সময় এ বিষয়ের উল্লেখ থাকবে, ইনশাআল্লাহ। এ গ্রন্থে সেলজুক সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের কাহিনিও বর্ণিত হয়েছে।

❁❁❁

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করেছি সেলজুক আমলে আব্বাসিদের মন্ত্রিত্ব-ব্যবস্থা এবং আব্বাসি খলিফার উজিরের গুণাবলি সম্পর্কে। আব্বাসি খলিফাদের কয়েকটি গুণ অবশ্যই থাকতে হতো—যেমন : জ্ঞানী হওয়া, সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদান, ন্যায়পরায়ণতা, উপযোগিতা, কূটনৈতিক দক্ষতা, দ্বীনি ও মন্ত্রণালয় বিষয়ে পর্যাপ্ত ধারণা থাকা, বিশুদ্ধভাষী হওয়া, সুন্দরভাবে চিঠিপত্র লিখতে পারা, জনপ্রিয় হওয়া, খেলাফতের দাপ্তরিক নীতিমালা সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা।

এ গ্রন্থে সেলজুক সুলতানদের উজিরের গুণাবলি নিয়েও আলোচনা করেছি—যেমন : ইলম ও উলামায়ে কেরামকে ভালোবাসা, ন্যায়পরায়ণতা, সততা, দ্বীনি বোধের গভীরতা, আরবি ও ফারসি উভয় ভাষায় দক্ষতা থাকা, রাজ্য ও সৈন্য-ব্যবস্থাপনা, বিচক্ষণতা ও সহনশীলতার ইতিহাসও।

আলোচনা করেছি আব্বাসি ও সেলজুক উজির নিয়োগদানের নীতিমালা, তাদের উপাধি ও বৈশিষ্ট্যাবলি, তাদের প্রশাসনিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও সামরিক যোগ্যতা এবং দক্ষতা সম্পর্কে; পদ থেকে বরখাস্ত ও অপসারণ, আব্বাসি-সেলজুকি মন্ত্রিত্বের পদ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় দর-কষাকষি ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্পর্কেও ইঙ্গিত দিয়েছি।

সেলজুক শাসনামলে আব্বাসি খলিফাদের অধিক প্রসিদ্ধ উজিরদের সংক্ষিপ্ত জীবনীও উল্লেখ করেছি; এ উজিরদের অন্যতম হলেন :—ফখরুদ্দৌলা ইবনু জাহির, আমিদুদ্দৌলা ইবনু জাহির, উজির আবু শুজা মুহাম্মদ ইবনুল হুসাইন আর-রুজারাওয়ারি প্রমুখ।

শেষোক্ত উজির আবু শুজা মুহাম্মদ ইবনুল হুসাইন আর-রুজারাওয়ারি মন্ত্রিত্ব সম্পর্কে বলেন—

تَوَلَّاها وَلَيْسَ له عَدُوٌّ + وَفَارَقَهَا ولَيْسَ له صَدِيْقٌ

> উজিরত্ব এমন একটি দায়িত্ব, এ দায়িত্ব গ্রহণকালে উজিরের কোনো শত্রু থাকে না। কিন্তু যখনই তিনি এ দায়িত্ব ছেড়ে দেন, তখন তার কোনো বন্ধু পাওয়া যায় না।

উজির হাসান ইবনু আলি ইবনু সাদাকাহ, শারাফুদ্দিন আলি ইবনু তররাদ আজ-জাইনাবি, মহান উজির আউনুদ্দিন ইবনু হুবাইরা (তার জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নুরুদ্দিন জিনকির জীবনীতে উল্লেখ থাকবে, ইনশাআল্লাহ) প্রমুখ সেলজুক উজিরগণের গুরুত্বপূর্ণ কর্মগুলোর আলোচনাও এসেছে এ গ্রন্থে।

❋❋❋

তৃতীয় অধ্যায়ে সেলজুকদের সামরিক প্রতিরক্ষা বিষয়ে আলোকপাত করেছি; সেলজুকদের সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রক ছিল তাদের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা।

এরপর সবিস্তার আলোচনা করেছি সেলজুক বাহিনীর সামরিক প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি নিয়ে; যেমন : ছেলেদেরকে সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ এবং বাহিনীর কমান্ডার ও অফিসার সংগ্রহে আগ্রহ তৈরি, বাহিনীর অভিজ্ঞতা-দক্ষতা-

ইখলাস ও ত্যাগ—সতর্কতা পর্যবেক্ষণ ও আনুগত্যপরায়ণতার বিবরণ, সৈনিক ও কমান্ডারদের মধ্যকার সম্পর্ক, সামরিক স্তর-বিন্যাসে ধারাবাহিকতা, প্রজ্ঞা-পরিকল্পনা ও সামরিক শক্তির সমন্বয়, ভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর সমন্বয়, সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি, দশকভিত্তিক সেনাবণ্টন—যেমন : কয়েক হাজারের নেতৃত্বে কয়েকশো জনকে কমান্ডার বানানো, পাঁচ-দশজন সৈন্যের দলভিত্তিক নেতৃত্ব নিয়োগ, সামরিক বিভাগসমূহের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি ও এ সম্পর্কে দক্ষদের অবস্থান, বন্ধক-জামিন ব্যবস্থা এবং সৈন্যদের আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি।

এমনিভাবে আলোচনা করেছি সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়মকানুন নিয়ে—যেমন : পরিচালনাভিত্তিক পদসমূহ, সেনাপতির গুণাবলি, সৈন্যদের ভাতা, সাধারণ পরিচালক-প্রহরীপ্রধান-মুকাদ্দিম, আমিদ-আতাবেক-সেনাবাহিনীর বিচারক, সেনা রেজিস্ট্রেশন মন্ত্রনালয়, সেনাদের নাম রেজিষ্ট্রিকরণ, সেনা মহড়া, সৈন্যদের দায়িত্ব বন্টন, রসদপত্র সরবরাহের প্রতি গুরুত্ব প্রদান, অস্ত্র-ইউনিফর্ম এবং বাসস্থানের ব্যবস্থাপনার বিষয়াদি সংক্রান্ত আলোচনা।

আরও আলোচনা করেছি সেলজুক সেনাবাহিনীর শ্রেণীবিন্যাস নিয়ে—যেখানে বিবৃত হয়েছে নিজামুল মুলকের অধীনস্থ বাহিনী, তুর্কমেনীয় বাহিনী, প্রশাসনিক বাহিনী, শহর-নিরাপত্তা বাহিনী, স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী, উবাশ বাহিনী, গোয়েন্দা বাহিনী এবং সেনাবাহিনীর গমনপথে তাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণকারী বাহিনীর বিবরণ।

আলোচনা করেছি সেলজুক বাহিনীর সৈন্যদের জাতিভেদ নিয়েও—যে বাহিনীতে ছিল তুর্কি, আরব, কুর্দি, দাইলাম এবং আর্মেনীয় সৈন্য। আলোচনা করেছি সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ইউনিট নিয়ে—যেমন : সশস্ত্র সৈন্য, তিরন্দাজ, অগ্নিগোলক নিক্ষেপকারী বাহিনী এবং মিনজানিক বাহিনী। সামরিক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ নিয়েও আলোচনা করেছি। সেলজুক সেনাবাহিনীর সংখ্যা এবং তাদের গোয়েন্দা ও গুপ্তচরদের নিয়মকানুন বিষয়ক তথ্যাবলিও উল্লেখ করেছি। সৈন্য এবং প্রকৌশলীদের মধ্যকার সামরিক সূত্র, সৈন্যদের খাবার সরবরাহ, চিকিৎসা সরবরাহ, তাদের ঘোড়া এবং যুদ্ধক্ষেত্রে এগুলোর ভূমিকা, সেলজুকদের নিদর্শন, প্রতীক এবং সেনাবাহিনীর অর্থের উৎস ইত্যাদি নিয়েও আলোচনা করেছি।

আলোচনা করেছি সেলজুদের আক্রমণমূলক, প্রতিরক্ষামূলক এবং প্রদর্শনমূলক অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপারে; নগর প্রতিরক্ষার নিয়মকানুন, অবরোধস্থাপক যন্ত্রসমূহ, অস্ত্র তৈরি এবং এর রক্ষণাগারের প্রসঙ্গও এসেছে। আলোচনা করেছি সেলজুকদের বিভিন্ন সমর-কৌশল নিয়ে—যেমন : দ্রুত গতিতে অভিযান চালানো, গুপ্তবাহিনীর ব্যবহার, পলায়নের ভান করে পুনঃপ্রতিরোধ আক্রমণ, শত্রুকে চারদিক থেকে বেষ্টন করে ফেলা, শত্রুদের উপর অতর্কিতে তিরবৃষ্টি বর্ষণ, শত্রুবাহিনীর সেনাদের মনে

ভীতিসঞ্চার, জলাশয় এবং গমনপথের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ ইত্যাদি। আলোচনা করেছি সামরিক নিরাপত্তা, বিভিন্ন সামরিক দায়িত্ব এবং প্রহরার বিষয়াদি নিয়েও।

পৃথক একটি অধ্যায়ে আলোচনা করেছি জিনকি, আইয়ুবি এবং মামালিক সাম্রাজ্যে সেলজুকদের নীতিমালার প্রভাব সম্পর্কে; এমনকি উসমানি সাম্রাজ্যও যে এ নীতিমালার মাধ্যমে প্রভাবিত ছিল, তাও উল্লেখ করেছি। সেলজুক সাম্রাজ্যের নারীদের ভূমিকার প্রতিও ইঙ্গিত করেছি।

❋❋❋

চতুর্থ অধ্যায়ে নিজামিয়া মাদরাসাসমূহের প্রতিষ্ঠাকাল, মাদরাসাগুলোর পঠন-পাঠনের লক্ষ্য, এসব প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য বাস্তবায়নে নিজামুল মুলকের গৃহীত পদক্ষেপ ও পদ্ধতি—যেমন : স্থান নির্বাচন, শিক্ষক বাছাইকরণ, সিলেবাস নির্ধারণ, উপকরণগত সুযোগ-সুবিধা পূর্ণকরণ, শিক্ষাবোর্ড গঠন, শিক্ষক নিয়োগ ও তাদের মধ্যে দায়িত্ববণ্টন এবং মুসলিম-বিশ্বে এসব মাদরাসার প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে।

এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো অসংখ্য সুন্নি-শাফেয়ি মতাবলম্বী আলেম তৈরি করার মধ্য দিয়ে নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছে; সেলজুক সাম্রাজ্যের জন্য দীর্ঘকাল ধরে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের পর্যাপ্ত জনবল তৈরি করেছে। বিশেষ করে সে যুগের অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিভাগ—তথা বিচার বিভাগ, হিসাব বিভাগ এবং ফতওয়া বিভাগ যোগ্যতাপূর্ণভাবে পরিচালনার জন্য কর্মদক্ষ ব্যক্তিদের তৈরি করেছে। এখান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত উচ্চ শিক্ষার্থী উলামায়ে কেরাম মুসলিম-বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন দাওয়াতি উদ্দেশ্যে। তারা মিশরে বাতেনি সম্প্রদায়ের সীমানা অতিক্রম করে উত্তর-আফ্রিকা পর্যন্ত পৌঁছে যান এবং সেখানকার সুন্নি মুসলিম জনতার সাহায্য-সহযোগিতায় অগ্রসর হন।

উম্মাহর জীবনে শক্তপোক্তভাবে আহলুস সুন্নাহর পথ ও পন্থা ফিরিয়ে আনতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে এ নিজামিয়া মাদরাসাগুলো। শিয়া-মতবাদের আধিপত্য ও প্রভাব সংকুচিত করতেও এ দ্বীনি প্রতিষ্ঠানগুলোর অবদান অনস্বীকার্য। বিশেষত এসব মাদরাসা থেকে শিয়া চিন্তাধারাবিরোধী বই-পুস্তক প্রকাশ হওয়ার পর এগুলোর অবদান দৃশ্যমান হতে শুরু করে। *আল-কিদহুল মুআল্লা* নামক গ্রন্থের লেখক ইমাম গাজালি রাহিমাহুল্লাহ ইসমাইলি-বাতেনি শিয়া মতবাদ প্রসারের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান গ্রহণ করেন।

এ মাদরাসাসমূহ নিজস্ব ইলমি উত্তরাধিকার, জনশক্তি ও যোগ্য আলেমদের মাধ্যমে জনগণের মাঝে বিশুদ্ধ আকিদা ছড়িয়ে দেয়, উম্মাহর চলার পথ সুগম করতে পালন করে সহায়কের ভূমিকা। নুরুদ্দিন জিনকি ও আইয়ুবিদের সামনে এগিয়ে যাওয়ার রাস্তা তৈরি করে দেন পৃষ্ঠপোষক উলামাগণ, যাতে তারা সে অভিযাত্রা ও মিছিল পূর্ণ করতে সক্ষম হন—যে উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে মাদারিসে নিজামিয়া। এর মাধ্যমে তৎকালে শাম, সিরিয়া, মিশর ও অন্যান্য যেসব অঞ্চলে শিয়া রাফেজি-বাতেনি গোষ্ঠীর প্রভাব ও আধিপত্য লাভ করেছিল, সেগুলোতে ইসলামের শুদ্ধ ও সঠিক নেতৃত্ব তৈরি করা সহজ হয়। এ মাদরাসাসমূহ সহিহ আকিদা-বিশ্বাস, সমুজ্জ্বল চিন্তাধারা, সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, আদর্শ জাতি গঠনের মাধ্যমে মুসলিম জাতিকে শক্তিশালী করে, যা জিনকি আমলে জিহাদের নেতৃত্ব তৈরিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। এসব মাদরাসার চিন্তা-বিশ্বাসের প্রভাব আইয়ুবি ও মামলুকি সাম্রাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে; এমনকি এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব বর্তমান কালেও দেখা যায়।

নিজামিয়া মাদরাসাসমূহ ফিকহে শাফেয়ির উসুল ও ঐতিহ্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে; ফলে মাদারিসে নিজামিয়ায় ফিকহে শাফেয়ির ঐতিহ্যের প্রভাব ছিল ব্যাপক; মহান এ ইমামের পরিচিতি তুলে ধরাও তাই প্রয়োজন মনে করেছি। তার সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্যর পাশাপাশি আকিদা-প্রমাণে তার নীতিমালা ও পন্থা-পদ্ধতিসমূহ—যেমন : ঈমানের হাকিকত, ঈমানের সংজ্ঞায় আমলের অন্তর্ভুক্তি, ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি হওয়া, কবিরা গুনাহকারীর হুকুম, তাওহিদুল উলুহিয়্যাহ, আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণে তার পদ্ধতি, তাওহিদুল আসমা ওয়াস সিফাত, সাহাবা কিরামের ব্যাপারে তার আকিদা, ফিকহের ক্ষেত্রে তার মানহাজের উপাদান, ফিকহ ও উসূলের ক্ষেত্রে মুজাদ্দিদের শর্তাবলির পূর্ণতা সম্পর্কে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি।

এমনিভাবে ইমাম আবুল হাসান আশআরি রাহিমাহুল্লাহ পরিচিতিও তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এ মহান ইমাম নিজ ইলমি উত্তরাধিকার ও তার কিতাবে প্রণীত চিন্তাধারার মাধ্যমে নিজামিয়া মাদরাসাসমূহের অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন—যেগুলোর স্বীকৃতি প্রদান করেছে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকাইদ। তিনি মুতাজিলাসহ আহলুস সুন্নাহ-বিরোধীদের মতবাদের প্রত্যাখ্যান-সংক্রান্ত যে সকল ইলমি আলোচনাসমূহের ব্যাপারে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন, সেগুলোও স্বীকৃত। আমি বর্ণনা করেছি ওই সকল ধাপসমূহ, যেগুলো তিনি অতিক্রম করে গেছেন এবং কীভাবে তিনি তৃতীয় স্তরে গিয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ'র মানহাজের মূলনীতির উপর স্থির হয়েছিলেন।

আলোচনা করেছি ইতিহাসে ইমাম আশআরির মর্যাদা সম্পর্কে। তার সে অনুসৃত আকিদাও সুস্পষ্ট করেছি, যা তিনি অনুসরণ করেন এবং পরিশেষে তার অনুসৃত বিশ্বাসের ব্যাপারেও আলোকপাত করেছি। মাদারিসে নিজামিয়ায় তার ইলমি ঐতিহ্যের

প্রভাব কেমন ছিল এবং কীভাবে সে প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে আইয়ুবি, মামলুকি ও উসমানি শাসকবৃন্দের আমলে, তাও আলোচনা করেছি। আরও আলোচনা করেছি আশআরি মনীষীদের প্রতি আল্লামা ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহর ন্যায়নিষ্ঠ ও ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি, আবুল হাসান আশআরি রাহিমাহুল্লাহর প্রশংসা, ইমাম বাকিল্লানি, জুয়াইনি ও ইমাম গাজালির ব্যাপারে তার অবস্থান সম্পর্কে; বিশেষভাবে আলোচনা করেছি নিজামিয়া মাদরাসাসমূহের প্রসিদ্ধ উলামায়ে কেরাম সম্পর্কে—যেমন : আবু ইসহাক শিরাজির পরিচিতি, তার মর্যাদা, তার ব্যাপারে মানুষের প্রশংসাবাণী, তার রচনাবলি ও কবিতা সম্পর্কে; আলোচনা করেছি ইমামুল হারামাইন আবদুল মালেক আল-জুয়াইনির পরিচিতি, তার ব্যাপারে মানুষের প্রশংসা, তার বিশেষ চরিত্র ও গুণাবলি সম্পর্কে; ইমাম জুয়াইনির বিশিষ্ট কিতাব *গিয়াসুল উমাম*-এর ইলমি অবস্থান সম্পর্কেও। উল্লেখ করেছি ইলমুল কালাম শিক্ষা করার ব্যাপারে তার নিষেধাজ্ঞা, সালাফের মাজহাবে তিনি ও ও তার সঙ্গীরা কেন প্রত্যাবর্তন করেছেন, তার আকিদা, ফিকহ, উসুলে ফিকহ, মতানৈক্য, বিতর্ক-মুনাজারা, রাজনীতি-জ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ক আলাপ-আলোচনাও।

নিজামিয়া মাদরাসার প্রথম সারির উসতাদ ইমাম গাজালি রাহিমাহুল্লাহর পরিচিতি তুলে ধরেছি; পাশাপাশি ইলম অর্জনে তার ত্যাগ-কুরবানি, ইমামুল হারামাইনের দীর্ঘ সাহচর্যগ্রহণ, বাগদাদের নিজামিয়ায় তার নিয়োগ, তার দক্ষতা ও প্রসিদ্ধির কারণ, তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া বিরাট পরিবর্তন, নির্জনতা হতে পুনর্বার শিক্ষাদানের পথে প্রত্যাবর্তন, তার রচনাবলির সময়কেন্দ্রিক ক্রমধারা ও বাতেনি শিয়া সম্পর্কে তার অবস্থান ইত্যাদি সম্পর্কে উল্লেখ করেছি। একইভাবে দর্শন ও দার্শনিক সম্পর্কে এবং ইলমুল কালাম ও তাসাওউফের ব্যাপারে তার দৃষ্টিভঙ্গি, তার সংস্কার-পদ্ধতি ও এর বৈশিষ্ট্যাবলি, সমাজের রোগ চিহ্নিতকরণে তার অবদান ইত্যাদি ব্যাপারেও আলোচনা রয়েছে।

উল্লেখ করেছি তার মতে সংস্কারের ক্ষেত্র, চারিত্রিক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষাদানে নতুন পদ্ধতির উদ্ভব সম্পর্কে; ইসলামি আকিদার ভিত্তি সুসংহতকরণ, আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারের পয়গাম পুনরুজ্জীবিতকরণ, জালিম শাসকদের সমালোচনা, সামাজিক ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার দাওয়াত, বিকৃত চিন্তাধারা ও মতবাদ প্রতিরোধে তার ভূমিকা সম্পর্কেও আলোকপাত করেছি। ইঙ্গিত করেছি বুদ্ধির অবাধ বিচরণ, তাকলিদ ত্যাগসহ নানা প্রকারের বিকৃত চিন্তা বিশুদ্ধকরণে তার অবদান সম্পর্কে; কুরআন-সুন্নাহর প্রতি তার আহ্বান, সালাফের নীতিতে অবিচলতা, ক্রুসেড বাহিনীর দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে তার সুদৃঢ় অবস্থান সম্পর্কেও আলোচনা করেছি।

আরও আলোচনা করেছি ইমাম বাগাভি রাহিমাহুল্লাহর পরিচিতি, সেলজুক শাসনামলে কুরআন-সুন্নাহর খেদমতে তার অবদান, উলামায়ে কেরাম ও তালিবুল ইলমদের মধ্যে তার কিতাবসমূহের প্রভাব সম্পর্কে।

আলোচনা করেছি আবু ইসমাইল আনসারি আল-হারাবির জীবনী, তার কিতাব *মানাজিলুস সায়িরিন* এবং তার বিরুদ্ধে শত্রুদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে।

নিজামিয়া মাদরাসা-সংক্রান্ত পাঠের মধ্যে আমি স্পষ্ট করেছি, মুসলিমদের মাঝে যেকোনো রাজনৈতিক, সামরিক ও সভ্যতাকেন্দ্রিক মিশনের সাফল্য অর্জনে আকিদাগত ও চিন্তাগত সমৃদ্ধি অর্জন অপরিহার্য। উম্মাহর জাগরণে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে হলে নেতৃত্বকে উদ্ভাবনী চিন্তার অধিকারী, লক্ষ্য নির্ণয়ে বিচক্ষণ, উম্মাহর আকিদা দ্বীন ও ঐতিহাসিক চেতনার ধারক হতে হয়। ইলমি ও ফিকরি পদসমূহ এবং অন্যান্য কৃতিত্বগুলোর বিন্যাসে সেগুলোকে ব্যক্তিগত কার্যক্রম হতে সামগ্রিক কার্যক্রমে রূপদানে সক্ষম হতে হয়; সার্বিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও বিভেদ নিরসনে তৎপর হতে হয়।

একইভাবে বিস্তৃত মুসলিম জনতার মাঝে আলেমসমাজের ইলমি ও ফিকরি তৎপরতা উম্মাহর জাগরণে যে বিরাট প্রভাবকের ভূমিকা রাখে, সে সম্পর্কেও আলোকপাত করেছি।

❋❋❋

পঞ্চম অধ্যায়ে সেলজুক আমলে সংঘটিত ক্রুসেড যুদ্ধ ও এসব যুদ্ধের ঐতিহাসিক মৌলিক বিষয়সমূহ সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

একইভাবে এ যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ কার্যকারণসমূহ—যেমন : দ্বীনি কারণ, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ, ভূমধ্যসাগরে শক্তির পালা পরিবর্তন; পোপ দ্বিতীয় আরবান কর্তৃক বাইজেন্টাইন সম্রাটের নিকট সাহায্য কামনা, তার পরিচিতি, ক্রুসেড যুদ্ধ-সংক্রান্ত তার প্রকল্প, প্রদত্ত ভাষণ ও এর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব—যেমন : তার বক্তব্যে কিতাবুল মুকাদ্দাসের বিভিন্ন উদ্ধৃতির অন্তর্ভুক্তি, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহে তার মতানুযায়ী অগ্রাধিকার নির্ণয়, পশ্চিম ইউরোপের শক্তিসমূহকে অন্তর্ভুক্তকারী ব্যাপক প্রকল্পসমূহ উপস্থাপন, শাম দখল ও প্রাচ্য নিয়ন্ত্রণে ইউরোপের আন্দোলন ইত্যাদি বিষয়েও সবিস্তার আলোচনা করেছি।

শুরু করেছি প্রথম ক্রুসেড যুদ্ধের বর্ণনা। প্রথমে সাধারণের হামলার বিবরণ দিয়েছি। অতঃপর ধারাবহিকভাবে আমিরদের হামলা, সে সম্পর্কে বাইজেন্টাইন সম্রাটের অবস্থান, নিকিয়ার পতন, দোরিলায়ুমের যুদ্ধ, কোনিয়া ও হারকালার পতন, এডেসা-

এন্টিয়ক-বাইতুল মাকদিস-ত্রিপোলি-সিডোন বা সাইদার ইমারাহ সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

চেষ্টা করেছি প্রথম ক্রুসেড হামলার সাফল্যের কারণসমূহ উদঘাটন করার। এ যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ কারণসমূহ বর্ণনা করেছি—যেমন : মুসলিম-বিশ্বে রাজনৈতিক ঐক্যের অনুপস্থিতি, ক্ষমতা নিয়ে সেলজুকদের মধ্যকার গৃহযুদ্ধ, ফাতেমি সাম্রাজ্যের উপস্থিতি, স্পেনে উমাইয়া খেলাফতের পতন, সিরিয়ায় অবস্থানকারী খ্রিষ্টানদের ভূমিকা, ক্রুসেডারদের ব্যাপারে কোনো কোনো আরব নেতৃত্বের অবস্থান, ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ লড়াইয়ে ইসমাইলি বাতেনি গ্রুপ কর্তৃক বাধাদান—যেমন : ক্রুসেডারদের প্রতি তাদের সহযোগিতা, মুসলিম সৈনিক ও নেতৃবৃন্দকে গুপ্তহত্যা করা, ইসলামি সমাজে ভয়-ভীতি ছড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি।

বাতেনিদের অপতৎপরতার ব্যাপারে ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহর ফতওয়া উল্লেখ করেছি। আরও যে সকল কারণ উল্লেখ করেছি, তা হলো—বাতেনি শিয়া মতবাদের ব্যাপক প্রচার-প্রসার, ক্রুসেড যুদ্ধের পূর্বে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিপর্যয়, বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের দুর্বলতা, ফিরিঙ্গি সৈনিকদের ব্যাপক সামরিক প্রশিক্ষণ, তাদের জন্য অব্যাহত ইউরোপীয় সহযোগিতা, ধর্মীয় ও জাগতিক অঙ্গনে স্বেচ্ছাচারিতার প্রভাব এবং ধর্মীয় শাখা-প্রশাখাগত বিষয়ে ব্যাপক দ্বন্দ্ব-সংঘাত ইত্যাদি। আলোচনা করেছি দখলদারিত্বের পর ক্রুসেড হামলার ছক-পদ্ধতি সম্পর্কেও।

আলাদাভাবে উল্লেখ করেছি, ক্রুসেড যুদ্ধ ও ইমাদুদ্দিন জিনকির উত্থানের মধ্যবর্তী সময়ে সেলজুক আমলে মুসলিম প্রতিরোধ-আন্দোলনের কথা। আলোচনা করেছি ক্রুসেড যুদ্ধ-প্রতিরোধে ফকিহ ও বিচারকদের পক্ষ হতে লেখনী ও কিতাব রচনার মাধ্যমে মুসলিমদের উদ্বুদ্ধকরণ, প্রতিরোধ যুদ্ধের ডাকে সাড়া দান, জিহাদের ময়দানে সরাসরি অংশগ্রহণ ও প্রতিরোধ যুদ্ধে কবিদের প্রচেষ্টা ও ভূমিকা সম্পর্কে।

আমি ইমাদুদ্দিনের পূর্বে সেলজুক সেনাপতিদের অবস্থা দু ভাগ করে বর্ণনা করেছি। যেমন—মসুলের অধিপতি কওওয়ামুদ্দৌলা কারবুগার জিহাদ, মসুলের আরেক শাসক জাকারমাশের জিহাদ, মারদিন ও দিয়ার-বাকিরের গভর্নর সাকমান ইবনু আরতাকের জিহাদ, বালিখের যুদ্ধ ও তাতে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের বিজয় ও উক্ত যুদ্ধের ফলাফল। আলোচনা করেছি কিলিজ আরসালানের এশিয়া মাইনর, মারসিভানের যুদ্ধ এবং হারকালার প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধ সম্পর্কে এবং বর্ণনা করেছি সেসব যুদ্ধাভিযান নিয়ে, যেগুলো শরফুদ্দিন মওদুদ ইবনু তুনতুকিন ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে পরিচালনা করেছেন; সে যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কেও আলোচনা করেছি। পরিচয় তুলে ধরেছি মারদিনের অধিপতি মহান মুজাহিদ সাইফুদ্দিন ইলগাজির; রক্তাক্ত প্রান্তরে তার বিজয় ও মুসলিমদের উপর তার ইন্তেকালের প্রভাব সম্পর্কেও আলোচনা করেছি।

কীভাবে বীর ইলগাজির ভাই বলক ইবনু বাহরাম জিহাদের ঝান্ডা হাতে নিয়েছেন, সে সম্পর্কেও আলোকপাত করেছি। তিনি ছিলেন ক্রুসেডারদের আতঙ্ক; তিনি ক্রুসেডারদের পতন ও ধ্বংস কামনা করতেন—কেবল আরব-উপদ্বীপে নয়, শাম ভূমিতেও। তিনি বিভিন্ন যুদ্ধে ক্রুসেডার সম্রাটদেরও গ্রেফতার করতে সক্ষম হন। তার শাহাদতের পর জিহাদের ঝান্ডা হাতে নেন মসুলের আমির আক সুনকুর আল-বারসাকি।

আলোকপাত করেছি বাতেনিদের হাতে বারসাকির হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে—সে সময় তিনি জুমার সালাতে প্রথম কাতারে ছিলেন! তিনি ছিলেন তুর্কি, ছিলেন দানবীর। আহলে ইলম ও বুযুর্গদের ভালোবাসতেন, ইনসাফের আচরণ করতেন ও সে দৃষ্টিভঙ্গি লালন করতেন। তিনি ছিলেন উত্তম গভর্নরদের একজন। যথাসময়ে সালাতের পাবন্দ ছিলেন। রাতে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করতেন।

তুলে ধরেছি বাতেনি ফিতনার ভয়াবহতাও। বাতেনিরা ছিল জিহাদি প্রতিরোধ-আন্দোলনের ভয়ংকর শত্রু। সে যুগে ইসলামি জিহাদের নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে তাদের বিদ্বেষের মুখোশ খুলে পড়েছিল। তাদের বিষাক্ত খঞ্জর মুসলিমদের বিরুদ্ধে আর ক্রুসেডারদের পক্ষে শাম ও জাজিরার জমিনে ভয়ংকর দুরভিসন্ধি গ্রহণের পথ উন্মোচিত করেছিল।

❋❋❋

উম্মাহর প্রতি মহান আল্লাহর বিরাট অনুগ্রহ হলো, মুজাহিদদের কাফেলাসমূহ এখনো আল্লাহর পথে জিহাদে সক্রিয় ও প্রস্তুত রয়েছে। ৫২১ হিজরি মোতাবেক ১১২৭ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান মাহমুদ মসুলের দায়িত্ব ইমাদুদ্দিন জিনকির হাতে অর্পণ করেন। তিনি ঘটনাপ্রবাহের নাটকীয়তায় সংযুক্ত হওয়ার পর মুসলিম ও ক্রুসেডারদের মধ্যকার শক্তির ভারসাম্যে নতুন ইতিহাসের সূচনা ঘটে।

ইমাদুদ্দিন জিনকি ক্রুসেডারদের প্রতিরোধে একটি সম্মিলিত মুসলমি জোট গড়ে তোলেন। ইতিহাসবিদ ইবনুল আসির ইমাদুদ্দিন জিনকির উত্থানের গুরুত্বকে নিম্নোক্ত ভাষায় তুলে ধরেছেন—

> যদি মহান আল্লাহ মুসলিমদের প্রতি শহিদ নুরুদ্দিন জিনকির নেতৃত্বের মাধ্যমে ইহসান ও অনুগ্রহ না করতেন, তাহলে ফিরিঙ্গি বাহিনী পুরো শামের দখল নিয়ে নিত।

ইমাদুদ্দিন ও জিনকি-পরিবার সম্পর্কে আমাদের পরবর্তী বইয়ে আলোচনা আসবে, ইনশাআল্লাহ। জিনকিদের আমলের ক্রুসেড যুদ্ধসমূহ সম্পর্কে, ইনসাফগার শাসক শহিদ নুরুদ্দিন মাহমুদ সম্পর্কে তাতে বিশদ বিবরণ থাকবে।

কোনো জাতি যদি অধঃপতন থেকে উঠে দাঁড়াতে চায়, তাহলে তাদেরকে অবশ্যই নিজেদের গৌরবময় ঐতিহ্যকে স্মরণ করতে হবে—যাতে অতীত-ইতিহাস থেকে বিভিন্ন পাঠ, শিক্ষণীয় ঘটনাবলি ও বর্তমানে তাদের অনুসরণীয় নীতি বের করে আনতে পারে এবং নিজেদের ভবিষ্যত উন্নত করতে পারে; প্রয়োজনে লড়াই ও সন্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ, দাওয়াত ও অন্যের সাথে আলোচনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ও উপকারী গ্রন্থাদি রচনা করতে পারে।

আমি মনে করি, এটি হবে চিন্তাগত, বিশ্বাসগত, সাংস্কৃতিক ও পদ্ধতিগত লড়াইয়ের অন্যতম নীতি। এটি রাজনৈতিক ও সামরিক লড়াইয়ের চেয়েও অগ্রগণ্য। যেকোনো সুদূরপ্রসারী ও কাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিশ্বাসগত, চিন্তাগত ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচিরও প্রয়োজন রয়েছে। শব্দ জন্ম দেয় তলোয়ার, জিহ্বা ও ভাষা থেকে সৃষ্টি হয় তির, গ্রন্থাদি থেকে তৈরি হয় অজস্র বাহিনী।

চলমান সময়ে মুসলিম উম্মাহ অনেক কঠিন কঠিন সমস্যা ও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে; সাথে সাথে নতুন করে ভিড় করছে পুরনো সংকটসমূহ। নিকটতম দিগন্তে ইসলামের শত্রুদের পক্ষ হতে ধ্বংসাত্মক প্রলয়ের উদ্ভব ঘটছে। এর মাধ্যমে তারা মুসলিম-বিশ্বের বুকে চিন্তাগত, সংস্কৃতিগত, বিশ্বাসগত, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের অপপ্রয়াস চালাচ্ছে।

উম্মাহর ডানা কেটে দেওয়ার পর তাদের কলবে আঘাত হানার প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের অপপ্রয়াস চলছে। ইতিমধ্যে ক্রুসেডাররা ফিলিপাইনের চার-পঞ্চমাংশ মানুষকে খ্রিষ্টান বানাতে সক্ষম হয়েছে; একই পরিকল্পনা নিয়ে অদ্য তারা অভিমুখী হয়েছে ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপাঞ্চলে। সিঙ্গাপুর থেকে তারা ইসলামের স্মৃতিচিহ্নসমূহ মুছে দিয়েছে; এখন তারা তাদের মিশন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দিকে প্রেরণ করছে।

ফিলিস্তিনে তো ইহুদিবাদী মিশন নিরন্তর গতিতে চলছে। অন্যদিকে আমেরিকা তো সামরিক ও রাজনৈতিক আগ্রাসন, মিডিয়ার আধিপত্যবাদ এবং অর্থনৈতিক শক্তির মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক লড়াইয়ে লিপ্ত। এর পাশাপাশি চলছে বাতেনি সম্প্রদায়ের চক্রান্ত ও তাদের রাজনৈতিক মিশন, যা উম্মাহকে বিভ্রান্ত করতে এবং আমাদের বিশুদ্ধ দ্বীনকে বিদআত, কুসংস্কার ও বিকৃত আকিদার মাধ্যমে নষ্ট করতে অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ক্রুসেডীয় মিশন, বাতেনি চক্রান্ত ও ইহুদিবাদী প্রকল্প উম্মাহকে প্রতিনিয়ত ক্ষতবিক্ষত করছে।

এহেন পরিস্থিতিতে মুসলিমদের দেহে কীভাবে নিস্পৃহতা ভর করতে পারে! অথচ তারা এসব পরিকল্পনা ও চক্রান্তসমূহ স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করছে। কীভাবে তাদের আহার ও বিশ্রাম শান্তিতে চলতে পারে!

মুসলিমগণ নিজেদের আলেমসমাজ ও ইসলামি চিন্তাবিদদের কাছ থেকে ইসলামবিদ্বেষীদের দ্বারা পরিচালিত ধ্বংসাত্মক মিশনসমূহের মোকাবেলায় আকিদাভিত্তিক, রাজনৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, মিডিয়াভিত্তিক কর্মসূচির ডাকের অপেক্ষায় রয়েছেন। এ উম্মাহ গ্রাসকারী আশঙ্কা অনুভব করছে আর বেঁচে থাকার জন্য জেগে উঠছে।

আশঙ্কা ঘনীভূত হচ্ছে। পরিবেশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়ার পাশাপাশি জাগরণের আবহও বিস্তৃত হচ্ছে। এ সর্বব্যাপী জাগরণের নেপথ্যে আমি ভালো কিছু প্রত্যাশা করি—পুরনো ব্যাধিগুলোর ব্যাপারে যদিও আমি শঙ্কিত—অর্থাৎ বিচ্ছিন্নতার কারণে রাজনৈতিক বিপর্যয়, অজ্ঞতা ও স্বেচ্ছাচারিতা দ্বারা সংস্কৃতি বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা। তাই সর্বসম্মত বিষয়সমূহের ব্যাপারে পারস্পরিক সহযোগিতা আর যতটুকু বিতর্কিত বিষয়সমূহ ইসলামি শরয়ি আইন ও মাকাসিদে শরিয়াহ, ফিকহুল মাকাসিদ, ফিকহুল মাসালিহ ও ফিকহুল খিলাফ সমর্থন করে, শরিয়াহ যতটুকু অনুমোদন করে, ততটুকুতে ছাড় দেওয়া উচিত।

আর আমাদের দ্বীন ও মাতৃভূমির বিরুদ্ধে যে নব্য আগ্রাসন শুরু হয়েছে, তার মোকাবেলায় আমাদের সবাইকে একতাবদ্ধ হওয়া জরুরি—যাতে আমরা সেসব আগ্রাসন প্রতিরোধ করতে পারি।

দায়িত্বশীলদের উচিত শক্তি সংগ্রহ ও দুর্বলতার ছিদ্রসমূহ বন্ধ করা এবং আমাদের হুমকিগ্রস্ত অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে সকল প্রকারের শক্তি সমবেত করার ক্ষেত্রে দ্রুততা অবলম্বন করা। এছাড়া যদি কেউ অন্য কোনো তৎপরতায় মুসলিমদেরকে জড়িত করে, তাহলে তারা হয়তো শত্রুর সাথে সমঝোতাকারী ও আমাদের পরাজয়ে শত্রুদের সহযোগিতাকারী মুনাফিক অথবা এমন নির্বোধ, যে অজ্ঞ বন্ধুর মতো ভূমিকা পালন করে। এ উভয় প্রকারের ব্যক্তি থেকে সতর্ক থাকা এবং উম্মাহকে তাদের অনিষ্টতা সম্পর্কে সচেতন করা জরুরি।

আমাদের জন্য অপরিহার্য হলো, পবিত্র কুরআনের নির্দেশনা ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ আঁকড়ে ধরা। নবজাগরণে করণীয় তৎপরতা ও বিজয়ের উপায়-উপকরণ শক্তভাবে ধরে থাকা—যেমন : আকিদার পরিশুদ্ধি, মানহাজের স্পষ্টতা, ব্যক্তি-পরিবার-সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্রসমূহে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত করা।

এর জন্যে দরকার এমন খোদাভীরু নেতৃত্ব, যারা আল্লাহর নুরের আলোয় চোখ মেলেন। দরকার এমন নেতৃত্ব, যার রয়েছে মহান আল্লাহর রীতি অনুযায়ী জাতিকে প্রশিক্ষণের, সাম্রাজ্যের গঠন ও বিনির্মাণের দক্ষ যোগ্যতা; সমাজের রোগ-ব্যাধি, জাতিসমূহের অবস্থান, ইতিহাসের অন্তর্নিহিত রহস্য, ক্রুসেডার ও নাস্তিক্যবাদ, বাতেনি ও উগ্র বিদআতিসহ সকল শত্রুদের পরিকল্পনা ও মিশন সম্পর্কে সম্যক অবগতি।

কোনো ধরনের চরমপন্থা ও শিথিলপন্থার আশ্রয় না নিয়ে প্রতিটি কর্মসূচিকে এর প্রাকৃতিক ও প্রাপ্য অধিকার অর্পণ করা উচিত। উম্মাহর জাগরণ ও অগ্রগতির সুদূরপ্রসারী প্রকল্প পাঠ-সংক্রান্ত বিষয়টি খুবই জটিল ও দুর্বোধ্য, একে পুরোপুরি অনুধাবন করা কেবল সেসব ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব, যাদের রয়েছে মহান আল্লাহর কিতাব পবিত্র কুরআন ও আল্লাহর রাসূলের সুন্নাহ বোঝার যোগ্যতা এবং যাদের সাথে রয়েছে আমাদের পূর্বসূরি আল্লাহভীরু উলামায়ে কেরামের দ্বারা সংরক্ষিত ইসলামি ফিকহের সম্পর্ক; তারাই বুঝতে পারবেন উম্মাহর জাগরণের আলামত, বৈশিষ্ট্য, অস্তিত্বের উপাদান ও পতনের কার্যকারণ।

ইসলামের ইতিহাস ও অতীত বিপ্লবসমূহের অভিজ্ঞতা থেকে তারা দিকনির্দেশনা গ্রহণ করতে পারবেন। তারা তখন অবশ্যই অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন, এ উম্মাহ যত দিনই মহান আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যে অবিচল ছিলেন, তত দিন তারা কখনো নেতৃত্বহারা হয়নি। তারা অবশ্যই অনুধাবন করতে পারবেন, সামরিক পরাজয় তো মূলত একটি সাময়িক সংকট, যা অল্প সময়ে নিরসন হয়ে যায়; কিন্তু সাংস্কৃতিক পরাজয় এমন ক্ষত, যা উম্মাহকে মৃত্যু ও স্থায়ী ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়।

বিশুদ্ধ সংস্কৃতি ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে কুরআন-সুন্নাহ, খুলাফায়ে রাশেদিন ও তাদের অনুসারীদের সুদৃঢ় আদর্শের উপর অবিচল রাখে। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের বিশুদ্ধ সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বই আজ অবধি এর অস্তিত্ব ও নির্মাণকে টিকিয়ে রেখেছে এবং তা সম্ভব হয়েছে শুধু মহান আল্লাহর তাওফিকে।

প্রিয় ভাইয়েরা, আমরা যারা ইসলাম ও মুসলিমদের সমস্যাবলি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করি, আমাদের জন্য অপরিহার্য হলো, এমন সব বিষয় হতে বিরত থাকা, যা আমাদের বর্তমান কিংবা ভবিষ্যতে কোনো উপকার বয়ে আনবে না—যা শুধুমাত্র আমাদের অবসর সময়গুলোকে ব্যস্ত করে রাখে আর মূল্যবান সময় বিনষ্ট করে; বরং আমাদের ওইসব বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত, যা নতুন করে উম্মাহর পুনর্জাগরণে ভূমিকা রাখে এবং মানুষকে আল্লাহর দ্বীনের পথপ্রদর্শনে উম্মাহর যে সোনালি যুগ ছিল, তা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে। আমাদের উচিত এমন আধ্যাত্মিক ও জাগরণী কর্মসূচি ও আদর্শ পেশ করা, যাতে চেতনাগত স্বপ্ন অন্তর্নিহিত থাকে, যা কার্যকরী সমন্বয়ে সফলতা লাভ করে।

আমাদের আরও উচিত মুসলিম সংস্কারকগণের পাঠসমূহকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং এ গুরুত্বপূর্ণ পাঠ তাদের সুরভিত জীবনী হতে উৎসারিত করা—তা ইলমি-রাজনৈতিক-প্রাতিষ্ঠানিক, সাংগঠনিক-অর্থনৈতিক, প্রতিরোধ-প্রশিক্ষণ কিংবা জিহাদ ইত্যাদি যে বিষয়েই হোক না কেন।

বর্তমানে ইসলাম একটি কঠিন সময় অতিক্রম করছে। ইসলামের শত্রুরা তাদের কোনো উদ্দেশ্য গোপন রাখছে না। তারা এসব বিষয়ে গোপনীয়তা বা সতর্কতা অবলম্বনের কোনো

প্রয়োজনই বোধ করছে না। ইহুদিরা সরাসরি বলে দিচ্ছে—আল-কুদস ছাড়া ইহুদিদের কোনো মূল্য নেই। আর বাইতুল মাকদিসের কোনো মূল্য নেই হায়কল[১] ছাড়া। তাদের এমন আচরণের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট; তা হলো—তাদের কাঙ্ক্ষিত হায়কল মসজিদে আকসার আঙিনাতেই অবস্থিত (আর তা অধিকার করাই তাদের অভীষ্ট গন্তব্য) ।

নব্য ক্রুসেডাররা বলছে—টিকে থাকার লক্ষ্যেই ইসরাইল প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। অপরদিকে বাতেনি-শিয়ারা সুন্নি মুসলিমদের রক্ত প্রবাহিত করা হালাল মনে করছে; সুন্নিদের সম্মান ভূলুণ্ঠিত করছে, তাদের সম্পদ কুক্ষিগত করছে। আহলুস সুন্নাহর চিহ্ন ও দ্বীনি শুদ্ধিকরণ চিহ্ন মুছে দেওয়াসহ বিকৃত সংস্কৃতি, বিদআত ও কুসংস্কারের প্রচার-প্রসারে রাতদিন অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, যা আমাদের আকিদা, ইতিহাস, ও চরিত্রকে মারাত্মকভাবে আঘাত করছে।

হে সম্মানিত ভাইয়েরা, এ লড়াই প্রকৃতপক্ষে ইসলামের পূর্ণ অস্তিত্ব নিয়েই। ইসলামের অস্তিত্ব পুরোপুরি বিলীন করার লক্ষ্যে শত্রুরা পরস্পর এ নিয়ে মতবিনিময় করছে—ইসলাম বর্তমানে যতটুকু অবশিষ্ট আছে, এর চেয়ে বেশি কেন থাকবে!

প্রিয় ভাইয়েরা, আমরাও কি নিজেদেরকে ধ্বংস ও নিঃশেষ হওয়ার দিকে ঠেলে দিচ্ছি! আমরা কি আমাদের দ্বীন ও পয়গামকে নতুন কসাইদের হাতে ছেড়ে দেবো? একজন আলেম মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে পারে, কিন্তু নিজের দ্বীনকে বিক্রি করতে পারে না।

দ্বীনের ব্যাপারে কেবল এমন গুটিকয়েক আলেমই আপসকামিতা অবলম্বন করতে পারে, যারা খেয়ানত ও কাপুরুষতার রোগে আক্রান্ত; যারা হারিয়ে ফেলেছে দ্বীন ও আত্মমর্যাদাবোধ; যারা তুচ্ছ কিছুর বিনিময়ে আরাম ও সুবিধা তালাশ করে—তারাই শুধু স্বধর্ম বিক্রি করার মতো জঘন্য কাজে লিপ্ত হতে পারে!

আমরা যেন আমাদের শত্রু ও আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান গ্রহণ করতে পারি, সেজন্য আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কিছু উপাদান ও উপকরণ সংগ্রহ করা জরুরি। সেগুলো হলো :—

• আমাদেরকে ইসলামের দিকে ফিরে যেতে হবে এবং এর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। আর ধর্মের নামে আমাদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়, তা নির্বাপিত করতে হলে আমাদেরকে দ্বীনের ছদ্মবেশ ধারণ করলে চলবে না, বরং সঠিক ইসলামে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আর যে আদর্শের উপর আল্লাহর রাসুল, খুলাফায়ে রাশেদিন ও সাহাবা কিরাম ছিলেন, তা অবশ্যই এমনভাবে সুস্পষ্ট করা জরুরি, যাতে কোনো

[১] ফিলিস্তিনের বৃহত্তম শহর কুদসে (জেরুসালেম) অবস্থিত ইহুদিদের প্রথম উপাসনালয়; এটি নির্মাণ করেন নবি সুলাইমান আলাইহিস সালাম। হিব্রু বাইবেলে এটিকে সলোমন'স টেম্পল বা সুলাইমানের গির্জা বলে অভিহিত করা হয়েছে।–অনুবাদক [আরবি উইকিপিডিয়া অবলম্বনে]

ধরনের বিভ্রান্তি না থাকে—যাতে আমরা বিদআতের কাদামাটি, কুসংস্কার ও অমূলক সংশয়ের জলাশয় থেকে বের হতে পারি, যেগুলো আমাদের প্রিয় ধর্ম ইসলামের নামে উম্মাহর মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে।

বর্তমানে আমরা লক্ষ করছি—কোনো কোনো মুসলিম-ভূখণ্ডে ইসলামের শত্রুদের সাথে লড়াইয়ে ইসলামকে বিলুপ্ত ও আড়াল করা হচ্ছে; দ্বীন ও আকিদার চেয়ে ভৌগোলিক ও ভূখণ্ডগত দূরত্ব বা বিভক্তিকে বড় করে দেখানো হচ্ছে; আলেম ও তালিবুল ইলমপক্ষীয় কিছু লোকও একে গ্রহণ করে নিয়েছে—এটা নিশ্চয় আত্মহনন ও ধ্বংসের পথ; আমাদের অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুরা এটাই চাইছে।

মাতৃভূমির প্রতি মানুষের ভালোবাসা ও একনিষ্ঠতার অবমূল্যায়ন আমরা করি না; কিন্তু তা হতে হবে পরিমিত পর্যায়ে। (নিজের দ্বীন-ধর্মের চেয়ে মাতৃভূমির প্রতি অতি ভালোবাসা দেখানো কোনো মুমিনের কাজ হতে পারে না।)

• ইসলামের সাথে কেবল পোশাকি সম্পর্ক বিভ্রান্তিকর ও মূল্যহীন। আমাদের আকিদা-বিশ্বাস, ইবাদত ও বিধি-বিধানের রুহানিয়ত ও আধ্যাত্মিকতা ফিরিয়ে আনা জরুরি। যে সকল মুসলিম, তাদের আকিদা, মানহাজ ও ইতিহাস উপস্থাপন করতে হীনম্মন্যতায় ভোগে, তাদের উচিত নব্য বাতেনিদের কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা, যারা নিজেদের বিদআত ও কুসংস্কার নিয়ে গর্ব করে। একইভাবে ইহুদিদের দিকেও তাকানো উচিত, যারা উন্নত রাজধানীতেও নিজেদের আকিদা ও ধর্মীয় রীতিনীতি প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হয় না। (বাতিলরা যদি নিজেদের ভ্রান্ত বিশ্বাস প্রদর্শনে হীনম্মন্যতায় না ভোগে, তাহলে আমরা কেন শ্রেষ্ঠধর্ম ইসলামের বিশুদ্ধ আকিদা আত্মবিশ্বাস ও গর্বের সাথে উপস্থাপন করতে পারব না!)

• যারা বিপথগামী রাজনীতিবিদদের সামনে প্রশংসার ধূপ জ্বালায়, তাদেরকে দ্বীনি অঙ্গন থেকে দূরে রাখতে হবে। এরা তুচ্ছ স্বার্থের লোভে পড়ে ওইসব রাজনীতিকদের তামাশা ও পশ্চাৎপদতাকে সুন্দর করে দেখায় (অথচ আদতে তাদের কর্মকাণ্ড খুবই কুৎসিত)। আর ইলমের দাবিকারী কিছু লোক আছে, তারা মানুষকে এমন সংশয়পূর্ণ বিষয় নিয়ে ব্যস্ত রাখে, যেগুলো অনেক পুরোনো—বর্তমান সময়ে প্রযোজ্য নয়। আর কেউ কেউ এমন ইখতিলাফ ও বিতর্ক নিয়ে ব্যস্ত, যেগুলো কেবল পর্দা ছিন্নকরণ কিংবা নিজেদের বিভক্তকরণ ছাড়া কোনো ফায়দা দেয় না। আর যে সকল আলেম দ্বীনের ভুল উপলব্ধির কারণে ইসলামের উপর অন্যায় করছেন, তারা মনে করেন—ইসলাম ক্ষমতা ও অর্থের ক্ষেত্রে একনায়কতন্ত্র, সুবিধাভোগী ও সমাজ বিনষ্টের সহযোগী (নাউজুবিলল্লাহ)! আর মধ্যযুগে ক্রুসেডারদের আক্রমণের সময় মুসলিমদের যে অবস্থা ছিল, বর্তমান পরিস্থিতি পূর্বের সে অবস্থার সাথে মিলে যায়।

মহান আল্লাহর সুন্নাহ বা চিরাচরিত নিয়ম যেমনিভাবে সীমালঙ্ঘনকারী অপরাধীদের কাছ থেকে বদলা নেয়, তেমনিভাবে অতিরঞ্জনকারী দুর্বলদের কাছ থেকেও বদলা নেয়। নিঃসন্দেহে বিপর্যয়ের বিভিন্ন উপাদান ও পশ্চিমা বাতেনিদের ঘুমপাড়ানি ইনজেকশন জড়তায় আচ্ছন্ন এ উম্মাহর মধ্যে ভেতর-বাহির—সব দিক থেকে প্রভাব বিস্তার করছে, যাতে উম্মাহকে পুরোপুরি নিঃশেষ করা সম্ভব হয়। ইতিমধ্যে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও বাতেনি চিন্তাধারা এমন একটি প্রজন্ম গঠনে সক্ষম হয়েছে, যারা ঈমান ও ফিকহের ক্ষেত্রে দোদুল্যমান, আল্লাহর প্রতি দুর্বল আস্থাসম্পন্ন, নিজের মানহাজ-দ্বীন-জাতি ও নিজের ব্যাপারে হীনম্মন্য; ফলে তারা নিজেদের দ্বীনের ব্যাপারেও হীনম্মন্যতায় ভোগে, নিজেদের পরিণতি সম্পর্কে কোনো পরোয়া করে না।

আমাদের দরকার এমন এক গণজাগরণ, যাতে আমাদের সকল কাঠামো অন্তর্ভুক্ত থাকবে; এর মাধ্যমে আমরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে সক্ষম হব। আমাদের পয়গাম এমন এক বিশ্বে, যেখানে কেবল শয়তানি মিশনের পরিচালকদের আধিপত্যের আওয়াজ শোনা যায়; এ কারণে আমরা আমাদের ইসলামের শাশ্বত সত্যের পয়গাম বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছুতে সচেষ্ট হব। তবেই আমাদের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর বক্তব্য যথার্থ হবে।

মহান আল্লাহ বলেন—

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ .

তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত। তোমাদের বের করা হয়েছে মানবজাতির কল্যাণের লক্ষ্যে। তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে, অসৎ কাজ থেকে মানুষকে নিষেধ করবে। আর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। [সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১১০]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللهَ وَكَفَى بِاللهِ حَسِيبًا .

যারা আল্লাহর বাণী প্রচার করে, আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না। আল্লাহই হিসাব গ্রহণকারী হিসেবে যথেষ্ট। [সুরা আহজাব, আয়াত : ৩৯]

এ গ্রন্থে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত, বাতেনি চক্রান্ত ও ক্রুসেড যুদ্ধের মধ্যকার সংঘাত সম্পর্কে বিভিন্ন পাঠ ও শিক্ষণীয় ঘটনাবলি রয়েছে।

আমি লক্ষ করেছি—বিশুদ্ধ আকাইদ, সুস্থ চিন্তাধারা ও উন্নত পরিকল্পনা, যেসবের উপর ভিত্তি করে সেলজুক শাসনামলে নিজামিয়া মাদরাসাসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেগুলো চিন্তা-গবেষণা, আকিদা-বিশ্বাস, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও দাওয়াতের ময়দানে বাতেনি চিন্তা-ভাবনাকে বড় ধরনের ক্ষতিগ্রস্ত করতে ও বাতেনিদের অপতৎপরতাকে কোণঠাসা করতে সক্ষম হয়েছে; তেমনিভাবে নিজামিয়া মাদরাসাসমূহ সক্ষম হয়েছে অনেক আলেম, নেতা, রাজনীতিক ও বিচারক তৈরি করতে। জিনকি সাম্রাজ্যে নিজামিয়া মাদরাসার বড় ভূমিকা ছিল।

এভাবেই আইয়ুবি, মামলুকি ও উসমানি শাসনামলে সাম্রাজ্যের আকিদাগত স্তরসমূহে চলতে থাকতে চিন্তা ও আকিদার প্রভাব বিস্তার। ইতিহাস পাঠের প্রকৃত ফলাফল হলো, এর মাধ্যমে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ বের করে আনা যায়, পাঠগ্রহণ ও ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি অনুধাবন করা যায়।

সে সকল পাঠ ও শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের মধ্যে কিছু বিষয়সমূহ উল্লেখযোগ্য :—

জাগৃতির আন্দোলনে অগ্রসরতার গুরুত্ব

ইতিহাসের বহু স্তরে অনেক ধর্ম ও মতবাদেই এমন কিছু ব্যক্তিত্বের অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে, যারা তাদের চিন্তা ও বিশ্বাসে একনিষ্ঠ ছিলেন। ফলে ওইসব মতবাদসমূহের এমন প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে, যা ইতিহাসের গতি পাল্টে দিয়েছে।

সেলজুক আমলে নিজামিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নিজামুল মুলকের অগ্রণী তৎপরতা লক্ষ করা যায়। বাতেনি ফিতনার বিরুদ্ধে আহলুস সুন্নাহর বিজয়ে এবং বাতেনি ফিতনা সংকুচিতকরণে এর রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা—তেমনিভাবে এ প্রতিষ্ঠান উম্মাহকে ইলমি, তারবিয়তি, রাজনৈতিক ও নেতৃত্বগত সাহায্যের মাধ্যমেও রেখেছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা; জিনকি ও আইয়ুবি আমলে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদি আন্দোলনে যে নেতৃত্বের রয়েছে উল্লেখযোগ্য অবদান।

বিপরীত ফ্রন্টে ছিল দ্বিতীয় আরবানের তৎপরতা। সে এমন ক্রুসেড প্রকল্প পেশ করে, যা পশ্চিম ইউরোপের সকল স্তরসমূহ একত্রিত করেছে এবং তা ছুড়ে মেরেছে প্রাচ্যের দিকে। নিজামুল মুলকের ছিল জাগরণের স্বপ্নের পাশাপাশি বিভিন্ন উদ্যোগ ও সাংস্কৃতিক প্রকল্প। অন্যদিকে পোপ দ্বিতীয় আরবানের ছিল দখলদারিত্ব ও উপনিবেশবাদী প্রকল্প। দুশো বছর ধরে উভয় প্রকল্পের মধ্যে লড়াই ও সংঘাত চলমান ছিল।

ইসলামি প্রকল্প পাশ্চাত্য ও মঙ্গোলীয় প্রকল্পের উপর বিজয় লাভ করে। এটা মহান আল্লাহর অনুগ্রহ।

নিজামুল মুলক, ইমাম গাজালি, জিহাদি আন্দোলনের আমিরগণ—যেমন : আমির মাওদুদ, ইমাদুদ্দিন, নুরুদ্দিন, সালাহুদ্দিন, জহির উদ্দিন বাইবার্স, কুতজ, নাসির ইবনু কলাউন, ইজ্জুদ্দিন ইবনু আবদুস সালাম ও ইবনু তাইমিয়া প্রমুখের অবদান অনেক।

বর্তমানে মুসলমনদের বস্তুগত, মানসিক ও কর্তৃত্বগত শক্তির কোনো কমতি নেই। এখন তাদের প্রয়োজন প্রজ্ঞাবান নেতৃত্বের, যারা উদ্যোগ গ্রহণের প্রকল্প বুঝতে সক্ষম—কল্যাণ ও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য যাতে তারা সমাজের শক্তিসমূহ পরিচালনা করতে সক্ষম হয় এবং তা পূর্ণতার দিকে পরিচালিত করতে পারে। আমাদের সমাজসমূহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে চিন্তা-সম্পদ-পরিকল্পনা এবং সংগঠন ও বস্তুগত শক্তির মুখাপেক্ষী।

সামনে আসছে খোদাভীরু নেতৃত্বের যুগ, যারা পদক্ষেপ গ্রহণে পারদর্শী—যারা বন্ধন সৃষ্টি করতে পারে সকল সূত্র ও পরিকল্পনার মধ্যে এবং শক্তি ও প্রতিভার মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। যেগুলোর মাধ্যমে তারা অগ্রসর হতে পারে উম্মাহর কল্যাণ, শ্রেষ্ঠত্ব ও উন্নতির পথে। এসব হবে এমন জাগরণের স্বপ্ন অনুযায়ী, যা সকল সংকটের মোকাবেলা করতে এবং সকল ছিদ্র ভরাট করে দিতে সক্ষম; জাগরণ তৈরিতে এসবের প্রতি উম্মাহ অধিক মুখাপেক্ষী। এগুলো মানুষের মাঝে আশা ও সুধারণার প্রাণ সঞ্চার করবে, যা তাদের উদ্বুদ্ধ করবে তাদের আকিদা ও আত্মমর্যাদা, আদর্শ ও ঐতিহ্য, দুনিয়ার তুচ্ছ সম্পদের উর্ধ্বে আরোহণ ও আত্মত্যাগের চেতনা জাগ্রত করতে—সাহসকে শানিত করতে, উম্মাহর মাঝে সুবিস্তৃত বিশাল জনগোষ্ঠী ও নির্বাচিত ব্যক্তিদের হৃদয়ে সংকল্প সুদৃঢ় করতে।

আমাদের উচিত মহান আল্লাহর এ বাণী স্মরণ করা, যেখানে তিনি বলেছেন—

إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.

> যদি তোমরা ব্যথা পেয়ে থাক, তাহলে মনে রেখো, তারাও আঘাতপ্রাপ্ত হয়, যেমনিভাবে তোমরা আঘাতপ্রাপ্ত হও। তোমরা আল্লাহর কাছ থেকে এমন বিষয়ের প্রত্যাশা করো, যা তারা করে না। [সুরা নিসা, আয়াত : ১০৪]

অনুসারীদের সতেজ করতে দ্বীনি চেতনার প্রয়োজনীয়তা

অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্মীয় চেতনা ও সক্রিয়তা মানুষের অনুভূতি ও সাহস জাগ্রত করে এবং তাদের অনুভূতিকে প্রভাবিত করে। পোপ দ্বিতীয় আরবান ক্রুসেড যুদ্ধের মিশনে এ ধর্মীয় চেতনাবোধকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়। তেমনিভাবে বাতেনিরা, বিশেষত হাসান আস-সাব্বাহও এ ধরনের চেতনা দিয়ে তার অনুসারীদেরকে বিশুদ্ধ ইসলামের বিরুদ্ধে উস্কে দিতে সক্ষম হয়।

যখনই মুসলিম নেতৃত্বে ও এ জাতির হৃদয়ে ইসলামি আকিদা প্রবলভাবে সঞ্চারিত হয় এবং মুমিনদের হৃদয়ে এর গুরুত্ব প্রবল হয়, তখন তারা বিরাট সংগ্রাম ও বড় ধরনের কুরবানি ও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হয়ে পড়ে—তখন তারা শক্তি অর্জন ও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় দক্ষতার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়ে ওঠে, এর শর্তাবলি বাস্তবায়নে ব্রতী হয়, উপকরণ সংগ্রহে উদ্যোগী হয় ও এর পদ্ধতি-প্রক্রিয়া আত্মস্থ করে নেয়। ধীরে ধীরে তারা তাদের সফলতার স্তরসমূহ অতিক্রম করে, লক্ষ্যসমূহ স্থির করে। ফলে তারা বাতেনি চক্রান্ত ও ক্রুসেড যুদ্ধে বিজয় লাভ করতে সক্ষম হয়।

এ গ্রন্থে আপনি দেখতে পাবেন—মুসলিমদের ঈমানি চেতনা ও অনুভূতি জাগ্রত করতে এবং তাদের মধ্যে সাহস জাগাতে, তাদের আকিদাকে পুনরুজ্জীবিত করতে উলামা, ফুকাহা, কাজি (বিচারক) ও ওয়ায়েজদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। অতএব, উম্মাহর উলামা, ফুকাহা ও ওয়ায়েজদের নিকট প্রত্যাশা, তারা যেন এ মহান ভূমিকা পালনে ব্রতী হন, তারা যেন ব্যক্তিগত স্বার্থ ও দুনিয়ার অস্থায়ী ভোগের ক্ষুদ্র স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে উম্মাহকে ঈমান, দ্বীনের জন্য আত্মত্যাগ, আত্মোৎসর্গ ও ইখলাসে দীক্ষিত করে গড়ে তোলেন।

আমরা উলামায়ে কেরামের কাছ থেকে এটা আশা করি না, তারা কেবল একাডেমিক পরিমণ্ডলে থেকে যাবেন। আমরা চাই না, উম্মাহর সাথে আলেমদের সম্পর্ক শুধু তালিবুল ইলমের ভিত্তিতে হবে, যা কেবল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাঠদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে; বরং আমরা চাই, তাদের মধ্যে মহান আল্লাহর এ বাণী প্রতিফলিত হোক—

أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

অথবা এমন ব্যক্তি, যে মৃত ছিল, অতঃপর আমরা তাকে জীবিত করলাম, তার জন্য এমন নুর দান করলাম, যা দ্বারা সে মানুষের মাঝে পথ চলতে পারে। সে কি এমন ব্যক্তির মতো হবে, যার উদাহরণ ওই ব্যক্তির মতো, যে অন্ধকারে রয়েছে, আর সেখান থেকে বের হতে পারছে না? এভাবেই কাফিররা যা করে, তা তাদের জন্য সুসজ্জিতরূপে প্রদর্শন করা হয়েছে।
[সুরা আনআম, আয়াত : ১২২]

وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ .

বহু নবির অনুসরণে অনেক মুত্তাকি আল্লাহর পথে জিহাদ করেছেন। আল্লাহর পথে লড়াই করতে গিয়ে তারা আঘাতপ্রাপ্ত হলেও কখনো হীনম্মন্য হননি, কখনো দুর্বলতা প্রদর্শন করেননি। মহান আল্লাহ সবরকারীদের ভালোবাসেন। তাদের কথা ছিল কেবল এটিই—তারা বলল, হে আমাদের রব, আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করুন, আমাদের কর্মে ঘটিত সীমালঙ্ঘন ক্ষমা করুন আর আমাদের কদম অবিচল রাখুন এবং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদের দান করেছেন দুনিয়া-আখিরাতের উত্তম প্রতিদান। মহান আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন। [সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৪৬-১৪৮]

অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুর ষড়যন্ত্র মোকাবেলায় ঐক্যের গুরুত্ব

শামে ক্রুসেড হামলার শুরুতে ছোট রাজনৈতিক কাঠামোগুলো বিভক্ত হয়ে যায়; তারা আব্বাসি খলিফা ও সেলজুক সুলতানের সাহায্য নিতে প্রচেষ্টা চালায়; ফলে বাগদাদে বিনা প্রয়োজনে প্রতিনিধিদলের আগমন বৃদ্ধি পায়। এখানে আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পাঠ হলো—কার্যকর দিকসমূহ প্রাধান্য দেওয়া ও পারস্পরিক মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার প্রচেষ্টা চালানো; অতঃপর এর সাথে ঐক্যবদ্ধতা। তখন আব্বাসি খলিফার জন্য জরুরি ছিল, আত্মিক ও বস্তুগত ভূমিকার মাধ্যমে পদক্ষেপ গ্রহণ করা; কিন্তু তখন তিনি ছিলেন একপ্রকার কর্তৃত্বশূন্য!

এ গ্রন্থে আলেপ্পো অবরোধের অধ্যায়ে আমরা দেখব, মুসলিমরা তখনই অবরোধ দূর করতে সক্ষম হয়েছিল, যখন তারা মসুলবাসীর সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়। ক্রুসেড হামলা প্রতিরোধ ও আঘাত করার ক্ষেত্রে মসুল, আলেপ্পো, দামেশকসহ শামের বিভিন্ন শহরের পারস্পরিক মৈত্রী-বন্ধনের বিরাট ভূমিকা ছিল। শামবাসী সক্ষম হয়েছিল মসুলবাসী, দিয়ার-বাকিরবাসী, কুর্দিদের বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে মিলে একটি সমন্বয়, পারস্পরিক সহযোগিতা, মৈত্রিতার পরিবেশ তৈরি করতে—সক্ষম হয়েছিল শামের উপর

অতিবাহিত-হওয়া ভয়ংকর বিপর্যয়ের অবস্থা থেকে রক্ষা পেতে। এগুলো হলো ইতিহাসের কিছু পাঠ ও শিক্ষা।

সম্মানিত পাঠক, ইনশাআল্লাহ এ গ্রন্থে এ ধরনের অনেক শিক্ষণীয় বিষয় পাবেন। সামাজিক আন্দোলনসমূহে ঈমান-কুফর, হক-বাতিল, হিদায়াত-গোমরাহি, কল্যাণ-অকল্যাণের মাঝে সংঘাতের প্রকৃতির ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর অমোঘ বিধান লক্ষ করবেন।

আমি এ গ্রন্থ লেখার কাজ সমাপ্ত করেছি ১৮ সফর ১৪২৭ হিজরি মোতাবেক ১৮ মার্চ ২০০৬ শনিবার রাত ১২টার দিকে।

সূচনা ও সমাপ্তির সর্ব প্রকার অনুগ্রহ মহান আল্লাহর। তাঁর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন এ কাজটি কবুল করেন এবং এর দ্বারা উপকারগ্রহণে বান্দাদের উন্মোচন করে দেন। আপন অনুগ্রহ ও দয়ায় তিনি যেন এ গ্রন্থে বারাকাহ দান করেন।

মহান আল্লাহ বলেন—

مَا يَفْتَحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

> মানুষের জন্য আল্লাহ যে রহমতের দরজা খুলে দেন, তা রোধ করার ক্ষমতা কারও নেই। আর তিনি যা রোধ করেন, তা খোলার ক্ষমতাও কারও নেই। তিনি মহা পরাক্রমশালী, মহা প্রজ্ঞাবান। [সুরা ফাতির, আয়াত : ২]

এ ভূমিকার শেষে কেবল আমি দাঁড়াতে চাই বিগলিত ও বিনম্র হৃদয়ে, যে হৃদয় মহান আল্লাহর প্রতি মনযোগী হয়ে তাঁর দয়া, অনুগ্রহ ও বদান্যতা স্বীকার করে। তিনিই সকল প্রকারের তাওফিক ও নিয়ামত দানকারী, তিনিই সাহায্যকারী এবং তিনিই তাওফিকদাতা।

সকল প্রশংসা তাঁরই, সূচনা ও সমাপ্ত করতে পারার দানের অনুকম্পার জন্য। আমি তাঁর কাছে তাঁর আসমাউল হুসনা ও সুউচ্চ গুণাবলির উসিলায় কামনা করি, তিনি যেন আমার আমলকে একমাত্র তাঁর উদ্দেশ্যে সম্পাদন করার তাওফিক দেন; তার বান্দাদের জন্য উপকারী করেন এবং আমাকে প্রতিটি হরফের বিনিময়ে সাওয়াব দান করেন—একে আমার সাওয়াবের পাল্লায় রাখেন।

আমার এ বিনীত প্রচেষ্টা সমাপ্তকরণে যেসব ভাই আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, আল্লাহ যেন তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেন।

যে সকল মুসলিম ভাই এ গ্রন্থ অধ্যয়ন করবেন, তাদের প্রতি আমার আরজ, যেন এ বান্দার জন্য মাগফিরাত, রহমত ও মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের দুআ করতে ভুলে না যান।

মহান আল্লাহ বলেন—

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ .

> হে আমার রব, আমাকে তাওফিক দান করুন, যেন আমি আপনার প্রদত্ত নিয়ামতের শোকর করতে পারি, যা আপনি আমার প্রতি অর্পণ করেছেন, আমার সন্তানদের দান করেছেন। আর আমি যেন ভালো কাজ করতে পরি, যাতে আপনি সন্তুষ্ট হন। আমাকে আপনার রহমতে পুণ্যবান বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। [সুরা নামল, আয়াত : ১৯]

হে আল্লাহ, আমি আপনার পবিত্রতা ও প্রশংসা ঘোষণা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আপনার কাছেই তাওবা করি। আমাদের শেষ দাবি এই—'সমস্ত প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক মহান আল্লাহর জন্যে প্রযোজ্য'।

মহান প্রভুর ক্ষমা, রহমত ও সন্তুষ্টিপ্রার্থী

—আলি মুহাম্মদ সাল্লাবি

১৮ সফর ১৪২৭ হিজরি

[সম্মানিত ভাইয়েরা, প্রকাশকালে আমার গ্রন্থাবলি সম্পর্কে আপনাদের পর্যবেক্ষণ ও অনুভূতি জানতে পেলে খুবই আনন্দিত হব।

প্রিয় ভাইদের কাছে দুআ চাই—যেন ইখলাস অর্জন, বাস্তবতার গভীরে পৌঁছা ও উম্মাহর ইতিহাসের খেদমতের যাত্রা অব্যাহত রাখা অধমের পক্ষে সম্ভব হয়।]

প্রথম অধ্যায়

সেলজুক রাজবংশ তাদের উৎস এবং সুলতানগণ

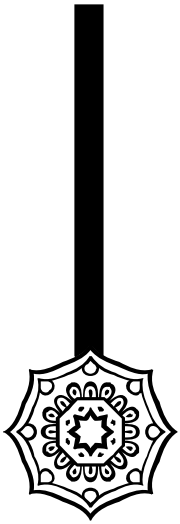

প্রথম পরিচ্ছেদ

সেলজুকদের উৎস, বসতি এবং উদ্ভবকাল

সেলজুক রাজবংশের উৎপত্তি তুর্কমেনিস্তানের কিনিক গোত্র থেকে। এ গোত্রটি তুর্কমেনিস্তানের অঘুজ নামে পরিচিত অন্যান্য তেইশটি উপজাতি গোষ্ঠীর সাথে মিলিত।[২] মা-ওয়ারাউন-নাহার তথা ট্রান্স-অক্সিয়ানার যে অঞ্চলকে আমরা বর্তমানে তুর্কিস্তান নামে পরিচয় দিয়ে থাকি, তা মঙ্গোলিয়ার মালভূমি থেকে শুরু করে পূর্বে উত্তর চীন, পশ্চিমে কাস্পিয়ান সাগর এবং উত্তরে সাইবেরিয়ান উপকূল থেকে নিয়ে ভারত উপমহাদেশ এবং ইরান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এ অঞ্চলেই গুজ বা অঘুজ উপজাতি এবং এদের অপরাপর গোত্রগুলির বসবাস ছিল।[৩] তারা এখানে 'তুর্কি' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।[৪] পরবর্তীকালে এ উপজাতিরা খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এসে নিজেদের প্রকৃত জন্মভূমি ছেড়ে বিশাল জনসংখ্যাসমেত এশিয়া মাইনরের দিকে হিজরত করে।

---

[২] *আখবারুদ দাউলাতিস সালাজিকিয়্যাহ* ২,৩; *নিজামুল ওয়াজারা আজ-জাহরানি*, পৃ. ৩১

[৩] *তারিখুত তুর্ক ফি আসিয়া আল-উসতা* (তারজামাতু আহমাদ আল-ঈদ), ১০৬; *আদ-দাউলাতুল উসমানিয়্যাহ*, পৃ. ২৩

[৪] *আখবারুল উমারা ওয়াল মুলুকিস সালজুকিয়্যাহ*, তাহকিক—ড. মুহাম্মদ নুরুদ্দিন, পৃ. ৪-৬

ইতিহাসবিদগণ তাদের এ হিজরত তথা অভিবাসনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণ উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ মনে করেন, তাদের এ অভিবাসন ছিল অর্থনৈতিক। প্রচণ্ড খরা-দুর্ভিক্ষ এবং বংশবৃদ্ধি এ গোত্রগুলোর আদি বাসস্থানকে অতি মাত্রায় ঘনবসতিপূর্ণ করে তুলছিল। ফলে খাদ্য, চারণভূমি এবং স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনের তালাশে সেখান থেকে তারা হিজরত করে।[৫]

কারও কারও ধারণা, তাদের এ অভিবাসন ছিল নানামুখী রাজনৈতিক স্বার্থঘটিত। সেকালে এ গোত্রগুলো ছিল সে অঞ্চলের অন্যান্য গোত্রদের দ্বারা প্রচণ্ড চাপের শিকার। ফলে নিরাপত্তা এবং সুস্থির জীবনের সন্ধানে তারা নিজেদের ভূমি ছেড়ে এশিয়া মাইনর অঞ্চলে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল।[৬] ড. আবদুল লতিফ আবদুল্লাহ ইবনু দাহিস এ মতের পক্ষে সমর্থন দিয়েছেন।[৭]

এ অভিবাসী গোত্রগুলো পশ্চিম অভিমুখী হতে বাধ্য হয়ে আমু দরিয়ার তীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থান করে। অতঃপর একসময়ে তারা তাবারিস্তান ও জুরজানে আবাস গড়ে তোলে।[৮] এর মধ্য দিয়ে তারা নাহাওয়ান্দ যুদ্ধ এবং ২১ হিজরি মোতাবেক ৬৪১ খ্রিষ্টাব্দে পারস্যের সাসানি সাম্রাজ্যের পতন-পরবর্তী সময়ে মুসলমানদের বিজিত ভূখণ্ডের নিকটবর্তী এলাকায় বসবাস শুরু করে।[৯]

এক. ইসলামি বিশ্বের সাথে তুর্কিদের সংযোগ

২২ হিজরি মোতাবেক ৬৪২ খ্রিষ্টাব্দে মুসলিম সেনাবাহিনী তুর্কিদের বসতি হালব তথা বর্তমান আলেপ্পো বিজয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। সেখানে মুসলিম সেনাবাহিনীর কমান্ডার আবদুর রহমান ইবনু রবিআহর সাথে তুর্কিদের রাজা শাহারবারাজের সাক্ষাৎ হয়। তিনি আবদুর রহমানের কাছে সন্ধি-প্রস্তাব পেশ করেন এবং মুসলিম বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে আর্মেনীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। আবদুর রহমান তাকে মুসলিম বাহিনীর প্রধান সেনাপতি সুরাকা ইবনু আমরের কাছে প্রেরণ করেন। শাহারবারাজ সুরাকার সাথে সাক্ষাৎ করে নিজের আর্জি পেশ করলে সুরাকা তা কবুল করে নেন এবং খলিফাতুল মুসলিমিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এ বিষয়টি

[৫] *কিতাবুস সুলুক,* আহমাদ আল-মাকরিজি, খণ্ড : ১, অধ্যায় : ১, পৃ. ৩

[৬] *কিয়ামুদ দাউলাতিল উসমানিয়্যাহ,* পৃ. ৮

[৭] *আল-কামিল ফিত তারিখ,* ৮/২২

[৮] *নাহাওয়ান্দ,* শাওকি আবু খলিল, পৃ. ৫৫-৭০

[৯] বিস্তারিত জানতে দেখুন—(ক) *আল-খিলাফাতুল আব্বাসিয়্যাহ : আস-সুকুত ওয়াল ইনহিয়ার,* ফারুক উমর ফাওজি; (খ) *তারিখুজ জানকিয়্যিন ফিল মুসিলি ওয়া বিলাদিশ শাম,* মুহাম্মদ সুহাইল তাক্কুশ; (গ) *আল-আসরুল আব্বাসি,* ড. খালিদ আজ্জাম

জানিয়ে পত্র লিখেন। খলিফা তার কাজে সম্মতি দেন। এর পরিপ্রেক্ষিতেই তাদের মাঝে সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয়।

মুসলিম বাহিনীর সাথে তুর্কিদের কোনো যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। আর্মেনিয়া বিজয় করে সেখানে তারা ইসলামের পতাকা উড্ডীন করার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে।[১০] মুসলিম বাহিনী ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে পারস্যের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলগুলো বিজয়ের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়। এর আগে তারা পদানত করে শক্তিশালী পারস্য সাম্রাজ্য—এতদাঞ্চলে মুসলিম সেনাবাহিনীর অগ্রযাত্রা রুখে দিতে তাদের ভূমিকা ছিল শক্ত দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মতো। এ প্রতিবন্ধকতা দূর হওয়ায় এবং মুসলিমদের বিজয়ের ধারাবাহিকতার ফলে এ অঞ্চলের মানুষের মুসলিম জাতিগুলোর সাথে সম্পৃক্ততার পথ উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। এদের মধ্যে ছিল তুর্কিরাও। মুসলিম জনগোষ্ঠীর সাথে তারাও সংযুক্ত হয়। দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করতে থাকে তুর্কিরা—আল্লাহর কালিমা ও দ্বীনের ঝান্ডাবাহী মুজাহিদগণের কাতারে এসে যোগ দেয় তারা।[১১]

খলিফা হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে তাবারিস্তান বিজিত হয়। অতঃপর ৩১ হিজরিতে মুসলমানরা আমু দরিয়া পার হয়ে মা-ওয়ারাউন-নাহার অঞ্চলে অবতরণ করে। তখন অনেক তুর্কি ইসলামধর্ম গ্রহণ করে এবং আল্লাহর দ্বীনকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে ইসলামের পক্ষে মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়।[১২] মুসলিম বাহিনী এ সকল এলাকায় তাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখে। ফলে হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে মুসলিম বাহিনী বুখারা জয় করে নেয়। বিজয়ী বাহিনী সম্মুখে এগিয়ে জয় করে নেয় সমরকন্দও। একপর্যায়ে মা-ওয়ারাউন-নাহারের সমস্ত এলাকা খেলাফতে রাশেদার অধীনে চলে আসে এবং এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীগুলো ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতি অনুযায়ী জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।[১৩]

আব্বাসি খলিফা ও আমির-উমারাদের দরবারে তুর্কিদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। একসময় তারা সাম্রাজ্যের সামরিক এবং প্রশাসনিক দায়িত্ব পেতে শুরু করে। সৈনিক, নেতা এবং কেরানি-পদে নিয়োগ পেয়েছিল বহু সংখ্যক তুর্কি। ধীর-স্থিরতা এবং আনুগত্য আঁকড়ে ধরার ফলস্বরূপ একপর্যায়ে তারা সাম্রাজ্যের বিভিন্ন উচ্চপদ অর্জন করে নেয়।

---

[১০] *তারিখুল উমামি ওয়াল মুলুক লিত তাবারি*, খণ্ড : ৩, পৃ. ২৫৬-২৫৭

[১১] *আদ-দাউলাতুল উসমানিয়্যাহ ওয়াশ শারকুল আরাবি*, মুহাম্মদ আনিস, পৃ. ১২-১৩

[১২] *ফুতুহুল বুলদান লিল বালাজুরি*, পৃ. ৪০৫-৪০৯

[১৩] *আদ-দাউলাতুল উসমানিয়্যাহ লিস সাল্লাবি*, পৃ. ২৫

খলিফা আল-মুতাসিম বিল্লাহ খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার সময় তুর্কিদের প্রভাব বিস্তারের দরজা খুলে দিয়েছিলেন এবং তাদেরকে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো অর্পণ করেছিলেন। এর মাধ্যমে তারা সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রশাসনিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। খলিফা আল-মুতাসিম কর্তৃক তুর্কিদেরকে কর্তৃত্ব প্রদান—এই নীতির লক্ষ্য ছিল আব্বাসি খেলাফত পরিচালনায় পারসিকদের একচ্ছত্র প্রভাব দূর করা। এ নীতি খলিফা মামুনের সময়কাল থেকে চলে আসছিল।[১৪]

তবে তুর্কিদের প্রতি খলিফা আল-মুতাসিমের মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্বদান প্রজাদের মনে খলিফার ব্যাপারে ক্ষোভ তৈরি করে। আঁচ পেয়ে বাগদাদের প্রায় ১২৫ কিলোমিটার উত্তরে তিনি সামাররা শহর প্রতিষ্ঠা করেন এবং তার সেনা ও সহযোগীরা সেখানে বসবাস করতে শুরু করে। সে সময় থেকেই তুর্কিরা ইসলামি ইতিহাসের মঞ্চে রাখতে শুরু করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। একপর্যায়ে তারা বিশাল একটি মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে ফেলে। আব্বাসীয় খলিফাদের সাথে তাদের ছিল মজবুত সম্পর্ক। এ সাম্রাজ্যই সেলজুক সাম্রাজ্য হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।[১৫]

দুই. সেলজুক রাজবংশের আত্মপ্রকাশ

সেলজুকদেরকে তাদের দাদা দুকাকের বংশধর বলা হয়। দুকাক আর তার গোত্রের লোকেরা বেগো নামক এক তুর্কি রাজার সেবায় নিয়োজিত ছিলেন।[১৬] সেলজুকদের ইতিহাসের এ সময়ে দুকাক ছিলেন অঘুজ তুর্কিদের অগ্রনায়ক—তাদের নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। কেউ তার বিরোধিতা করত না এবং কোনো আদেশ লঙ্ঘন করত না।[১৭]

সেলজুক ইবনু দুকাকের পূর্বে তার পিতাও রাজা বেগোর সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। সেখানে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক দায়িত্ব (মুক্বাদ্দিমাতুল জাইশ/লেফট্যানেন্ট কর্নেল) পালন করতেন। ঐতিহাসিক সূত্র অনুযায়ী, এ সময়ে তার মধ্যে উন্নতি-অগ্রগতি এবং নেতৃত্বের সকল লক্ষণ সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছিল।[১৮] এমনকি তার প্রতি লোকদের অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্য দেখে রানি স্বামীর ক্ষমতার ব্যাপারে শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। এ শঙ্কা তাকে স্বামী-হত্যায় প্ররোচিতও করেছিল।[১৯]

---

[১৪] *কিয়ামুদ দাউলাতিল উসমানিয়্যাহ*, পৃ. ১২

[১৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২

[১৬] *আদ-দাওলাতুস সালজুকিয়্যাহ মুনজু কিয়ামিহা*, সামিরাহ আল-জাবুরি, পৃ. ৬৮

[১৭] *প্রাগুক্ত*, ৬৯; *আল-কামিল ফিত তারিখ*, খণ্ড : ৮, পৃ. ২২

[১৮] *আখবারুদ দুওয়াল ওয়া আসারুল উওয়াল*, খণ্ড : ২ পৃ. ৪৫১

[১৯] *আদ-দাওলাতুস সালজুকিয়্যাহ মুনজু কিয়ামিহা*, পৃ. ৭০

এসব বুঝতে পেরে সেলজুক নিজ অনুসারীদের নিয়ে ইসলামি ভূখণ্ড অভিমুখে যাত্রা করেন[২০] এবং শিবির স্থাপন করেন সির (সাইহুন) দরিয়ার নিকটবর্তী জুন্দ নামক উপকণ্ঠে।[২১] সেখানে সেলজুক ইসলামধর্ম গ্রহণের ঘোষণা দেন এবং পৌত্তলিক তুর্কিদের উপর আক্রমণ শুরু করেন। জুন্দ উপকণ্ঠে সেলজুকের মৃত্যুর পর সন্তানগণ বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করে তুর্কি পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখে এবং মুসলিম অধিবাসীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যায়।[২২] ক্রমান্বয়ে তাদের শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং রাজত্ব প্রসারিত হয়। এসব কিছুর ফলে পার্শ্ববর্তী মুসলিম শাসকগণ তাদেরকে সম্মান এবং সমীহের দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করে।[২৩]

সেলজুকপুত্র মিকাইল পৌত্তলিক তুর্কিদের সাথে আমরণ যুদ্ধ করেছেন। অবশেষে কোনো এক অঞ্চলের যুদ্ধে তিনি শাহাদাত লাভ করেন।[২৪]

তিন. সেলজুকদের আবির্ভাবের আগে ইসলামি প্রাচ্যের অবস্থা

[ক] সামানীয় সম্প্রদায় (২০৪-৩৯৫ হি.)

এরা পূর্বপুরুষ সামানের বংশধর। তিনি ছিলেন পারস্যের প্রসিদ্ধ দেহকান গোত্রের একজন। তারা ছিলেন একটি প্রাচীন পারসিক পরিবারের সদস্য এবং তাদের আদি বাসস্থান ছিল বলখ। মুসলিম সাম্রাজ্যের সাথে সামানের প্রথম পরিচয় ঘটে উমাইয়া খলিফা হিশাম ইবনু আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ানের (১০৫-১২৫হি.) শাসনামলে। তিনি তখন খোরাসানের তৎকালীন গভর্নর আসাদ ইবনু আবদুল্লাহ আল-কাসরির কাছে গমন করেছিলেন। সে সময় খোরাসানে, বিশেষ করে বলখ প্রদেশে ব্যাপকভাবে তুর্কি ও দেহকান গোত্রের লোকদের[২৫] উপর্যুপরি সংঘাত চলছিল। আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণের এ তাণ্ডবে সামান পালিয়ে আসাদ কাসরির কাছে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। আসাদ কাসরি ছিলেন নির্যাতিত আরব এবং পারসিক, সমানভাবে উভয় পক্ষেরই আশ্রয়দাতা।[২৬]

আসাদ আল-কাসরি সামানকে খুবই সমাদর করেন এবং যাবতীয় সুরক্ষা প্রদান করে তাকে বলখ পুনরুদ্ধারে করেন সার্বিক সহযোগিতা।[২৭] আসাদ আল-কাসরির এ

---

[২০] *প্রাগুক্ত*

[২১] *প্রাগুক্ত*

[২২] *আল-কামিল ফিত তারিখ*, ৮/২২; *আদ-দাওলাতুস সালজুকিয়্যাহ মুনজু কিয়ামিহা*, পৃ. ৭৩

[২৩] *আদ-দাওলাতুস সালজুকিয়্যাহ মুনজু কিয়ামিহা*, পৃ. ৭৩

[২৪] *দাউলাতু সালজুক লিল-বুনদারি*, ৫; *আদ-দাওলাতুস সালজুকিয়্যাহ*, সামিরাহ আল-জাবুরি, পৃ. ৭৩

[২৫] দেহকান/দুহকান—উভয় উচ্চারণে ব্যবহৃত হয়।—অনুবাদক

[২৬] *তারিখু বুখারা মুনজু আকদামিল উসুর*, পৃ. ১৪

[২৭] *আদ-দাওলাতুস সালজুকিয়্যাহ মুনজু কিয়ামিহা*, পৃ. ১৪

মহানুভবতায় সামান তার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তার প্রতি ভালোবাসা ও সম্মান প্রদর্শনস্বরূপ ছেলের নাম রাখেন 'আসাদ'।

খলিফা হারুনুর রশিদ যখন আলি ইবনু ঈসা ইবনু মাহানকে খোরাসানের গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন, তখন আসাদ ইবনু সামান ছিলেন আলির সহযোগীদের একজন। তিনি গভর্নর থাকাকালীন আসাদের মৃত্যু হয়।[২৮] খলিফা হারুনুর রশিদের শাসনামলে রাফে ইবনু লাইস নামক এক ব্যক্তি মা-ওয়ারাউন-নাহার অঞ্চলে অভিযান পরিচালনা করে সমরকন্দ[২৯] শহরে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে নেয়। ফলে খলিফা হারুনুর রশিদ হারসামা ইবনু আইয়ুনের নেতৃত্বে এক বিশাল বাহিনী রাফের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এ পর্যায়ে এসে আমরা দেখতে পাই, আদাস ইবনু সামানের লোকেরা হারমাসার পক্ষে অবস্থান নেয় এবং তার শক্তি বৃদ্ধিতে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে। তাদের প্রচেষ্টা ও সহযোগিতার কারণে রাফে ইবনু লাইস হারমাসার সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হয় এবং সমরকন্দে তাদের কর্তৃত্বের অবসান ঘটে।[৩০]

খলিফা আল-মামুনের (১৯৮-২১৮ হি.) সময়ে আসাদের চার পুত্র খলিফার প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য ও সেবার কল্যাণে তার অধিক আস্থাভাজন হয়ে ওঠে এবং তার সমীহ অর্জনে সক্ষম হয়। খলিফা তাদেরকে নিজের সকল কাজে সহযোগী করে নেন। খোরাসানের গভর্নর গাসসান ইবনু আববাদের কাছে এ চারজনকে মা-ওয়ারাউন-নাহার প্রদেশের সবচেয়ে বড় অঞ্চলগুলির একেকটির গভর্নর নিযুক্ত করার নির্দেশনামা পাঠান। ফলে নুহ সমরকন্দের, আহমাদ ফারগানার,[৩১] ইয়াহইয়া শাস[৩২] ও উশরুসানার[৩৩] এবং ইলিয়াস হেরাতের গভর্নর নিযুক্ত হন।[৩৪]

এ প্রদেশগুলোতে নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে এনে এবং আব্বাসি খেলাফতের ভিত্তি মজবুত করে তারা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাদেরকে যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, তারা এর যথাযোগ্য। এ অঞ্চলগুলো ইতিপূর্বে খেলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

---

[২৮] *প্রাগুক্ত*

[২৯] সমরকন্দ—বর্তমান উজবেকিস্তানে অবস্থিত। এটি উজবেকিস্তানের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর।–নিরীক্ষক

[৩০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫

[৩১] ফারগানা—উজবেকিস্তানের রাজধানী থেকে ৪২০ কিলোমিটার দূরবর্তী একটি প্রাদেশিক শহর। আল্লামা সুয়ুতির *তারিখুল খুলাফা* থেকে জানা যায়, ৯৪ হিজরিতে খলিফা ওয়ালিদ ইবনু আবদুল মালিকের শাসনামলে মুসলিমরা সর্বপ্রথম এ অঞ্চল বিজিত করে।—নিরীক্ষক

[৩২] শাস—বর্তমান উজবেকিস্তানের রাজধানী তাশখন্দ। উজবেকিস্তানে বৃহত্তম শহর।—নিরীক্ষক

[৩৩] উশরুসানা—মা-ওয়াউন-নাহারের অন্তর্ভুক্ত একটি ঐতিহাসিক স্থান। ফারগানা এবং খুজান্দের মাঝখানে অবস্থিত।—অনুবাদক

ইয়াকুত হামাভি উল্লেখ করেন, সমরকন্দ থেকে উসরুসানার দূরত্ব ছিল ষাট ফারসাখ—*মুজামুল বুলদান*, ১/১৯৭।—নিরীক্ষক

[৩৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৫

এবং ষড়যন্ত্রের উর্বর ভূখণ্ড ছিল। এ চার ভাইয়ের অবদানে সেখানে কোনো বিদ্রোহ আর মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি। সকল বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে তারা নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছিলেন এবং এ অঞ্চলের প্রতিটি প্রান্তে সুনাম-সুখ্যাতি এবং মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান লাভ করেছিলেন।[৩৫]

চার ভাইয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন আহমাদ। একপর্যায়ে ফারগানা, শাস, সুগদ[৩৬] আর সমরখন্দের একাংশের শাসনক্ষমতা তার হাতে চলে আসে। তিনি আমৃত্যু (২৫০ হি.) এতদাঞ্চলের শাসনকার্য পরিচালনা করেন।[৩৭] পরবর্তীতে ছেলে নাসর ২৫৯ হিজরি পর্যন্ত এখানে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। সেখানে তাহেরিদের[৩৮] আধিপত্য সমাপ্ত হয়ে যাওয়ায় তিনি সরাসরি আব্বাসি খেলাফতের অনুসরণ করেছিলেন।[৩৯]

খলিফা আল-মুতামিদ ২৬৩ হিজরিতে নাসর ইবনু আহমাদকে সমগ্র মা-ওয়ারাউন-নাহার অঞ্চলের শাসক নিযুক্ত করেন। তিনি সামানীয়দের ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পর্যায়ে এসে রাষ্ট্র ও শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন। এ সময়কে সামানীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রকৃত সূচনা হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। আব্বাসি খেলাফতের কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে অবস্থিত এ অঞ্চলের বিরাজমান পরিস্থিতি সামানীয়দের জন্য সেখানে তাদের শাসন সুসংহত করার সুবর্ণ সুযোগ তৈরি করে দিয়েছিল। তারা হয়ে উঠেছিল প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী।

তারা এ অঞ্চলে অব্যাহত বাণিজ্য এবং বিভিন্ন পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার পাশাপাশি মুসলিম ভূখণ্ড সুরক্ষার দায়িত্ব দৃঢ়ভাবে আঞ্জাম দেয়। তারা রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনে সফল হয়েছিল। এ অর্জন পরবর্তীকালে খোরাসানের দিকে অগ্রসর হতে তাদের সক্ষম করে তুলেছিল।[৪০]

২৭৯ হিজরিতে নাসরের মৃত্যু হয়। তার পর সামানীয়দের নিয়ন্ত্রণ নেন ভাই ইসমাইল ইবনু আহমাদ।[৪১] তিনি একইসাথে রাজনৈতিক, সামরিক ও প্রশাসনিক সকল দিক দিয়ে ছিলেন সামানীয়দের অন্যতম অবিসংবাদিত শাসক। তার রাজত্বকালে সামানীয়

---

[৩৫] *তারিখু ইবনি খালদুন*, ৪/২২৬; *আদ-দাওলাতুস সালজুকিয়্যাহ*, সামিরাহ আল-জাবুরি, পৃ-১৫

[৩৬] সুগদ—এটি ছিল সমরকন্দের অধীন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ নয়নাভিরাম একটি শহর—*মুজামুল বুলদান*, ৩/৪০৯।—নিরীক্ষক

[৩৭] *আল-কামিল* ফিত তারিখ, *আদ-দাওলাতুস সালজুকিয়্যাহ মুনজু কিয়ামিহা*, পৃ-১৫-এর উদ্ধৃতি দিয়ে

[৩৮] তাহির ছিলেন আব্বাসি সাম্রাজ্যের একজন সেনাপতি। ২০৫ হিজরিতে খলিফা মামুনুর রশিদ তাকে খোরাসান অঞ্চলের শাসক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেন। তার পরবর্তীতে তার বংশধররা এখানে শাসন পরিচালনা করে। তাদেরকেই তাহেরি বলা হয়েছে। বিস্তারিত জানতে দেখুন—*ইতিহাসের দর্পণে খলিফা আল-মামুন*, ৯৫-১০০।—নিরীক্ষক

[৩৯] *আদ-দাওলাতুস সালজুকিয়্যাহ মুনজু কিয়ামিহা*, পৃ-১৬

[৪০] *মাদখালুন ইলা তারিখিল হুরুবিস সালিবিয়্যাহ*, সুহাইল, পৃ-১৬

[৪১] *তারিখুত তাবারি*, *আদ-দাওলাতুস সালজুকিয়্যাহ মুনজু কিয়ামিহা*, পৃ-১৭-এর উদ্ধৃতি দিয়ে

সাম্রাজ্য সমৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল। এ সময়ে রাজ্যের সীমানা প্রসারিত হয়েছিল এবং তাদের স্বাধীনতা হয়েছিল আগের চেয়ে অনেক বেশি সুরক্ষিত।[৪২] ইসমাইল বুখারাকে[৪৩] রাজধানী হিসেবে গ্রহণ করেন। তার শাসনকালে চিন্তা-গবেষণার খাতে সেখানে ব্যাপক সমৃদ্ধি সাধিত হয় এবং ইসলামি সংস্কৃতির বিপ্লব ঘটে।[৪৪]

ইসমাইলের মৃত্যুর পর ২৯৫ হিজরিতে সামানীয় সাম্রাজ্যের শাসনভার অর্পিত হয় পুত্র আহমাদের হাতে।[৪৫] তৎকালীন আব্বাসি খলিফা আল-মুকতাফি (২৮৯-২৯৫ হি.) তার শাসনক্ষমতার স্বীকৃতি প্রদান করেন এবং একই বছরের রবিউস সানি মাসে তাকে খোরাসান এবং মা-ওয়ারাউন-নাহার অঞ্চলের ক্ষমতাও প্রদান করেন।[৪৬] সামানীয় শাসক আহমাদ ইবনু ইসমাইল শাসনকার্যে স্বীয় যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছিলেন। তিনি নিজ শাসনামলে প্রশাসনিক উদ্ভূত সকল সমস্যা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং খেলাফতের সীমানার বাইরে পৌত্তলিক তুর্কি যাযাবরদের বেশ কয়েকটি অঞ্চল জয় করে নিয়েছিলেন। এর প্রতিদানস্বরূপ খলিফা তাকে বাগদাদের পুলিশ বিভাগ এবং পারস্য ও কিরমানের প্রশাসনিক দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন।[৪৭]

❁❁❁

সামানিরা তুর্কিদের সাথে লড়াইয়ের কৌশল পরিবর্তন করে এবং তুর্কিদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্ব প্রদান করতে শুরু করে। মুসলিম সেনাপতি কুতাইবা ইবনু মুসলিম এ অঞ্চল জয় করার সময় থেকে সির দরিয়া উপত্যকায় পৌত্তলিক তুর্কিদের বিরুদ্ধে যে প্রতিরক্ষা-কৌশল ব্যবহৃত হয়ে আসছিল, সামানিরা তা বর্জন করে। এ প্রাচীন পদ্ধতিটি দুর্গ প্রতিষ্ঠা এবং পরিখা খননের উপর নির্ভরশীল ছিল; এ পদ্ধতি মুসলমানদেরকে তুর্কিদের আকস্মিক আক্রমণ থেকে রক্ষা করত।

সামানিরা সাইহুন উপত্যকার দুর্গ ও পরিখার পিছনে থেকে প্রতিরক্ষার সে পদ্ধতি পরিবর্তন করে। দুর্বৃত্ত তুর্কিদেরকে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তারা চারণভূমিতে আক্রমণ করার পন্থা অবলম্বন করে। এমনকি তারা ধ্বংস-হয়ে-যাওয়া এ দুর্গগুলোর নির্মাণ ও

[৪২] *আদ-দাউলাতুত সালজুকিয়্যাহ মুনজু কিয়ামিহা*, পৃ-১৭
[৪৩] বুখারা—উজবেকিস্তানের পঞ্চম বৃহত্তম শহর। ইমাম বুখারি রহিমাহুল্লাহুর জন্মস্থল।—নিরীক্ষক
[৪৪] *আদ-দুওয়াইলাতুল ইসলামিয়্যাহ ফিশ-শারক*, মুহাম্মদ আলি হায়দার, পৃ-৯৭
[৪৫] *আদ-দাওলাতুস সালজুকিয়্যাহ*, পৃ-১৮
[৪৬] *তারিখুত তাবারি*, *আদ-দাওলাতুস সালজুকিয়্যাহ মুনজু কিয়ামিহা*, পৃ-১৯-এর উদ্ধৃতি দিয়ে
[৪৭] *আদ-দাওলাতুস সালজুকিয়্যাহ মুনজু কিয়ামিহা*, পৃ-১৯

পুনঃর্নির্মাণও পরিত্যাগ করে। মুসলিম ভূখণ্ডের সুরক্ষাকল্পে তাদের গৃহীত এ পদ্ধতির প্রভাব পড়ে তুর্কিস্তানের সাথে ইসলামের সম্পর্কের উপর।

তখন মা-ওয়ারাউন-নাহারের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী ধারাবাহিকভাবে দলে দলে বিভিন্ন সবুজ-শ্যামল অঞ্চল, এমনকি মরু অঞ্চলের অভ্যন্তরেও পাড়ি দিতে শুরু করেছিল। সেখানে তারা কলোনি আকারে বসবাসের উপযোগী করে বেশ কিছু ছোট ছোট শহর প্রতিষ্ঠা করে আবাস গড়ে তোলে। এখান থেকেই তাদের অর্থনৈতিক তৎপরতা শুরু হয়।

অর্থনৈতিক তৎপরতার পাশাপাশি এ অঞ্চলে ইসলামি দাওয়াতের বিস্তৃতির ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন আল্লাহর পথের একনিষ্ঠ দাঈগণ। তাদের এ অগ্রগতি বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার পাশাপাশি তুর্কিদেরকে ইসলামের সাথে পরিচিত করে তুলতেও বিরাট ভূমিকা পালন করে। ফলে পরবর্তীকালে তারা সদলবলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছিল।[৪৮]

ইসলামের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা এবং নৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের পাশাপাশি তাদের বেদুইন প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ইসলামি আকিদার সহজতা তাদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করে তুলেছিল। ইতিপূর্বে মা-ওয়ারাউন-নাহারের যে অভিবাসীরা হিজরত করেছিল, তাদের জীবনাচারেও তারা দেখতে পেয়েছিল এ বৈশিষ্ট্য। অতঃপর পুরাতন অভিবাসীদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ নবাগত অভিবাসীদের সাথে ফিরে এসে মরুভূমির অভ্যন্তরের সবুজ শ্যামল ভূমিতে কলোনি আকৃতির শহর স্থাপন করেছিলেন।[৪৯]

আল্লাহর অনুগ্রহ এবং দয়া, সামানীয় পরিবারের মাধ্যমে তুর্কি জাতি-গোষ্ঠীর মাঝে যে ইসলাম প্রচারিত হয়েছিল, তা ছিল সুন্নি ইসলাম।[৫০] আর তুর্কিরা এই মতাদর্শ (সুন্নি মতাদর্শ)[৫১] দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেছিল।

সামানীয় সাম্রাজ্যের অবসান

সামানীয় শাসক আহমাদ ইবনু ইসমাইল শাসনকার্যে যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। তিনি সক্ষম হয়েছিলেন তার শাসনকালে প্রশাসনে উদ্ভূত যাবতীয় সমস্যা সফলভাবে মোকাবেলা করতে।

---

[৪৮] *আত-তারিখুস সিয়াসি ওয়াল ফিকরি লিল-মাজহাবিস সুন্নি ফিল মাশরিকিল ইসলামি*, পৃ-১০১

[৪৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ-১০১

[৫০] *প্রাগুক্ত*, পৃ-১০২

[৫১] এখানে 'সুন্নি' বলতে শিয়াদের বিপরীত মতাদর্শ বুঝানো হয়েছে।—অনুবাদক

আহমাদ ইবনু ইসমাইলের মৃত্যুর পর ৩০১ হিজরিতে আট বছরের শিশু সাঈদ নাসর তার স্থলাভিষিক্ত হয়। তার শাসনামলের শুরু থেকেই সামানীয় সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য এবং বহুমুখী ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। বিভিন্ন প্রদেশের শাসকরা নিজ-নিজ প্রদেশের স্বাধীনতার দাবিতে বিদ্রোহ করে বসে। কিন্তু সামানীয় এ শাসক তার ত্রিশ বছরের রাজত্বকালে এ সকল বিদ্রোহীদের দমনে সফল হয়েছিলেন।[৫২]

তবে জেনে রাখা উচিত, সামানীয় সাম্রাজ্যের দুর্বলতা এবং পতন শুরু হয়েছিল হিজরি চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে, যখন সামানীয় রাজবংশের সদস্যদের নিজেদের মধ্যেই রাজত্ব নিয়ে দ্বন্দ্ব ও বিভক্তির বীজ বপিত হয়। এর শুরু হয়েছিল যখন সাঈদ নাসরের চাচা ইসহাক ইবনু আহমাদ সাম্রাজ্যের ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেছিলেন এবং সমরকন্দকে বানিয়েছিলেন নিজের কর্তৃত্বের ঘাঁটি।[৫৩]

একদিকে সামানীয় সাম্রাজ্য দুর্বল হতে শুরু করে আর অন্যদিকে শুরু হয় ইরাক থেকে পরিচালিত শিয়া বুওয়াইহিয়্যাদের উত্থান। বুওয়াইহিয়্যারা সামানীয় সাম্রাজ্যের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি দেওয়ার ফলে উভয় পক্ষ যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সামানীয় সাম্রাজ্য চারদিক থেকে ক্রমবর্ধমান চাপের মুখে পড়ে যায়।

উত্তর ও পশ্চিমে তারা দাইলামি এবং আলাভিদের চাপের মুখে পড়ে, এর পাশাপাশি সেসব তুর্কি অভিবাসীদের চাপেও তারা পড়েছিল, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল এই সামানীয়দের হাতেই।[৫৪] ৩২৪ হিজরিতে বুওয়াইহিয়্যারা সামানীয়দের হাত থেকে কিরমান রাজ্য এবং এখানকার সৈনিকদের জন্য বরাদ্দকৃত সকল সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে সেখানে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।[৫৫]

এমনিভাবে বিভিন্ন সংকটময় পরিস্থিতি সামানীয় সাম্রাজ্যকে কারাখানি ও গজনভিদের মাঝে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার দুয়ার খুলে দেয়। ফলশ্রুতিতে মা-ওয়ারাউন-নাহার চলে যায় কারাখানিদের দখলে আর বাকি সব অঞ্চল চলে যায় গজনভিদের শাসনে।[৫৬]

২. গজনভি সম্প্রদায় (৩৫১-৫৮২ হি.)

গজনভি সাম্রাজ্যের নামকরণ করা হয়েছে আফগানিস্তানের একটি শহর গজনা বা গজনি থেকে। এ সাম্রাজ্যের উত্থান ঘটে সবুক্তগিন নামক এক মুসলিম সেনাপতির মাধ্যমে। তিনি সামানীয়দের পক্ষ থেকে গজনা অঞ্চলের গভর্নরের দায়িত্ব পালন

[৫২] *আদ-দাওলাতুস সালজুকিয়্যাহ*, পৃ-১৯

[৫৩] *তারিখুত তাবারি*, *আদ-দাওলাতুস সালজুকিয়্যাহ মুনজু কিয়ামিহা* , পৃ-১৯-এর উদ্ধৃতি দিয়ে

[৫৪] *আল-আলামুল ইসলামি ফিল আসরিল আব্বাসি*, পৃ-৩১৬

[৫৫] *আদ-দাওলাতুস সালজুকিয়্যাহ*, পৃ-২০

[৫৬] *আল-কামিল ফিত তারিখ*, *আদ-দাওলাতুস সালজুকিয়্যাহ*-এর উদ্ধৃতি দিয়ে

করেছিলেন। অতঃপর তিনি পূর্বদিকে তার রাজত্ব সম্প্রসারিত করেন। এমনকি তিনি খোরাসান প্রদেশও নিজ রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন।

৩৮৪ হিজরিতে মা-ওয়ারাউন-নাহার অঞ্চলে বিদ্রোহ দমনের পুরস্কারস্বরূপ নুহ ইবনু মানসুর সামানি তাকে সেখানকার গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। তবে সবুক্তগিন নিজের কার্যক্রম পরিচালনা সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন ভারতবর্ষ অভিমুখে। সামানীয়দের দখলে-থাকা ভূখণ্ডের দিকে তার তেমন আগ্রহ ছিল না।

সামানিরা যখন খোরাসানে খারেজিদের বিদ্রোহ দমন এবং বুওয়াইহিদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে তার সহযোগিতা কামনা করেছিলেন, তখন তিনি তার বাহিনী নিয়ে নুহ ইবনু মানসুরের সাথে যোগ দিয়েছিলেন। সবুক্তগিন এবং তার সন্তান মাহমুদ সামানীয়দের সামরিক সহযোগিতায় এ সকল খারেজি এবং বুওয়াইহিয়্যা সম্প্রদায়ের বিপক্ষে বিজয় লাভে সক্ষম হন। পাশাপাশি তারা নিশাপুর শহরকে পুনরুদ্ধার করে সামানীয়দের কাছে ফিরিয়ে দেন। অতঃপর সামানীয় শাসক নুহ ইবনু মানসুর সবুক্তগিনের ছেলে মাহমুদকে নিশাপুরের প্রশাসক নিযুক্ত করেন; প্রদান করেন খোরাসানের সামরিক বাহিনীর কর্তৃত্ব এবং 'সাইফুদ্দৌলা' (রাজ্যের তলোয়ার) উপাধিতে ভূষিত করেন। আর বাবা সবুক্তগিনকে প্রদান করেন 'নাসিরুদ্দৌলা' (রাজ্যের সাহায্যকারী) উপাধি।[৫৭]

শুরুর দিকে সবুক্তগিন ভারতীয় অঞ্চলগুলোতে যুদ্ধ পরিচালনায় ব্যস্ত ছিলেন।[৫৮] এতে তিনি ব্যাপক সফলতা অর্জন করেন। ভারতের উপকণ্ঠে অভিযান চালিয়ে অনেক দুর্গ তিনি জয় করে নিয়েছিলেন। হিন্দুদের সাথে তার অনেক বড় বড় যুদ্ধ সংঘটিত হয়।[৫৯]

হিন্দু রাজা জয়পালের সাথে তার ভয়ানক লড়াই হয়েছিল। ৩৬৯ হিজরিতে সবুক্তগিন তাকে পরাজিত করেন। নির্ধারিত পরিমাণ সম্পদ প্রদান, কয়েকটি প্রদেশ হস্তান্তর এবং পঞ্চাশটি হাতি প্রদানের শর্তে সবুক্তগিন তাকে সন্ধি করতে বাধ্য করেছিলেন। চুক্তি সম্পাদিত হয়ে গেলে জয়পাল রাজ্য হস্তান্তরের জন্য নিজের কিছু লোককে সবুক্তগিনের কাছে বন্ধক দেন। সবুক্তগিন তাদেরকে নিয়ে নিজ দেশে রওনা হয়ে যান। সবুক্তগিন ভারতবর্ষ অতিক্রম করার পর জয়পাল তার বন্ধককৃত লোকদের পরিবর্তে তার রাজ্যে-থাকা সকল মুসলমানদেরকে বন্দি করে ফেলেন। সবুক্তগিনের কাছে এ খবর পৌঁছুলে তিনি পুনরায় ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন এবং পথিমধ্যে যত এলাকা অতিক্রম করেন, সবগুলোকেই লণ্ডভণ্ড করে দেন। তিনি তাদের সবচেয়ে সুরক্ষিত এবং সুন্দর দুর্গ

[৫৭] *আল-আলামুল ইসলামি ফিল আসরিল আব্বাসি*, পৃ-৩৮৬
[৫৮] প্রাগুক্ত
[৫৯] *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খণ্ড-১৭, পৃ-৪৮৪

লামগান দখল করেন। সমস্ত মূর্তিঘর ধ্বংস করে তদস্থলে স্থাপন করেন ইসলামি স্মৃতিস্তম্ভ। অতঃপর তিনি গজনিতে ফিরে আসেন।

এদিকে জয়পাল এক লক্ষ সৈনিক নিয়ে তার পিছু নেয়। সবুক্তগিন তাকে আবারও নিরঙ্কুশভাবে পরাজিত করেন, অসংখ্য হিন্দুকে বন্দি করেন এবং তাদের ধন-সম্পত্তি গনিমত হিসেবে গ্রহণ করেন। এ যুদ্ধের পর হিন্দুরা সকলেই তার অনুগত হয়ে যায়। তাদের আর কোনো দাপট অক্ষত থাকে না। তারা তাদের নিজেদের দেশের দাবি ছেড়ে দিতে সম্মত হয়ে যায়। এ যুদ্ধের পর সবুক্তগিনের ক্রমবর্ধমান শক্তি প্রত্যক্ষ করে আফগানরাও তার নেতৃত্ব মেনে নেয়।[৬০]

তার রাজত্ব ছিল প্রায় বিশ বছর। তার মধ্যে ছিল ইনসাফ, সাহসিকতা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপসহীন ব্যক্তিত্ব।[৬১] ৩৭৮ হিজরিতে তার মৃত্যুর পর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন পুত্র ইসমাইল। এক তীব্র যুদ্ধের মাধ্যমে ইসমাঈলের ছোট ভাই মাহমুদ তার হাত থেকে ক্ষমতা দখল করে নেন।[৬২]

১. মাহমুদ গজনভি

অত্যন্ত আফসোসের বিষয়, অধিকাংশ শিক্ষাবিদ এবং বিশ্ববিদ্যালয়-গ্রাজুয়েটরা মহান এ সুন্নি সুলতান সম্বন্ধে এবং আফগানিস্তান অঞ্চলে তার বিরাট রাজত্ব সম্পর্কে কোনো ধারণা রাখেন না।

তার জীবনচরিতে আমলের প্রতি যে পরম স্পৃহা, দ্বীনের ঝান্ডা উঁচু করার প্রচণ্ড আগ্রহ, নিজ সৈনিকদের মধ্যে জিহাদ ও শাহাদাতের জজবা তৈরি, সুন্নাতের প্রসার ও বিদআতের মূলোৎপটনের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল, তা কজন জানে! রাজত্ব সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে তার প্রতি আন্তরিক ভালবাসা, আত্মনিবেদন ও বিশ্বস্ততা নিয়ে চারপাশে লোকেদের জমায়েত হওয়ার পিছনে যে ইসলামের আদর্শিক মূল্যবোধের ভূমিকা ছিল, সে ব্যাপারেও শিক্ষিতসমাজ অনবগত।[৬৩]

সুলতান মাহমুদ গজনভির জীবনাদর্শ এবং তার সাম্রাজ্য নিয়ে বিশেষভাবে অধ্যয়ন-গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। তালিবুল ইলম এবং ইতিহাস-গবেষকদের আহ্বান জানাব, তারা যেন আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর নীতি অনুসরণ করে ইসলামি গ্রন্থাগারের এ শূন্যতা পূরণে এগিয়ে আসেন; রাষ্ট্র পরিচালনায় সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার গুরুত্ব তুলে ধরেন; এ মহান সুন্নি বীরের ব্যাপারে রাফেজি-বাতেনিদের ছড়ানো গুজব, বিভ্রান্তি এবং

[৬০] *আল-কামিল ফিত তারিখ, আল-আলামুল ইসলামি ফিল আসরিল আব্বাসি*, ৩৬৯ পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি দিয়ে
[৬১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খণ্ড-১৬, পৃ-৫০০
[৬২] *প্রাগুক্ত*, খণ্ড-১৭, পৃ-৪৮৫
[৬৩] *তারিখুনা বাইনা তাজওয়িরিল আদা ওয়া গাফলাতিল আবনা*, পৃ-১৮০

মিথ্যা প্রোপাগান্ডার উপযুক্ত জবাব প্রদান করেন। সংক্ষিপ্ত হলেও এখানে স্বল্প পরিসরে তার ব্যাপারে আলোচনা আনা উচিত বলে মনে করছি।

ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ তাকে সীমান্তরক্ষী ন্যায়পরায়ণ মহান বাদশা বলে উল্লেখ করেছেন। সীমান্তপ্রহরী, আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত মুজাহিদ ইয়ামিনুদ্দৌলা আবুল কাসিম মাহমুদ ইবনু সবুক্তগিন। তিনি ছিলেন গজনা এবং বড় বড় রাজ্যের শাসক। ভারতের অধিকাংশ রাজ্যের পরাক্রমশালী বিজয়ী। হিন্দুদের মূর্তি-প্রতিমা ধ্বংসকারী এবং নিজ সামর্থ্য দিয়ে হিন্দু এবং তাদের সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর রাজাকে পরাজিতকারী।[৬৪]

তিনি প্রজাদের সাথে সদা ন্যায়পরায়ণ আচরণ করতেন। ইসলামের সকল বিধান পরিপূর্ণরূপে পালন করতেন। তিনি ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য অঞ্চলে অনেক বিজয়াভিযান পরিচালনা করেছিলেন। সমস্ত পৃথিবীতে তার প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল। আল্লাহর দয়া ও অনুকম্পায় তার রাজত্ব বিস্তৃতি লাভ করেছিল। প্রজাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং তার রাজত্বকাল দীর্ঘ হয়েছিল।

আব্বাসি খলিফা কাদির বিল্লাহ'র অনুগত থেকে তিনি তার পুরো রাজ্য পরিচালিত করতেন। মিশরের ফাতেমীয়দের প্রতিনিধিদল তার জন্য বই-পুস্তক এবং হাদিয়া-উপঢৌকন নিয়ে আগমন করত। তিনি সেসব বই-পুস্তক, চিঠিপত্র পুড়িয়ে দিতেন এবং তাদের দেওয়া পোশাকগুলো ছিঁড়ে ফেলতেন।[৬৫] ফাতেমীয়দের মতাদর্শপ্রচারক তাহিরাতি যখন মিশর থেকে সুলতান মাহমুদকে গোপনে বাতেনি ফিরকার দাওয়াত দিতে এসেছিল (তাহিরাতি এমন একটি খচ্চরে আরোহণ করত, যেটি ঘণ্টায় ঘণ্টায় রং পরিবর্তন করত), তখন সুলতান মাহমুদ তার গোপন উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে রাগান্বিত হয়ে যান। পাপিষ্ঠ তাহিরাতিকে হত্যা করে তিনি তার খচ্চরটি হেরাতের বড় আলেম কাজি আবু মনসুর মুহাম্মদ আল-আজদিকে হাদিয়া দিয়ে বলেন, এত দিন এ খচ্চরে অবিশ্বাসীদের নেতা আরোহণ করত। আর এখন থেকে বিশ্বাসীদের নেতা আরোহণ করবে।[৬৬]

ভারতবর্ষে সুলতান মাহমুদ গজনভির মতো এত বিপুল বিজয়াভিযান তার পূর্বাপরের কোনো রাজা-বাদশা পরিচালনা করতে পারেননি। তিনি অসংখ্য হিরা-জহরত, স্বর্ণ-রৌপ্য এবং বন্দি গনিমত হিসেবে লাভ করেছিলেন। হিন্দুদের অনেক মূর্তি, প্রতিমা এবং দেব-দেবী ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। আল্লাহ তাকে সম্মানিত করুন, তার পরকালীন নিবাসকে আরামদায়ক করুন।

---

[৬৪] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খণ্ড-১৫, পৃ-৬২৮

[৬৫] *প্রাগুক্ত*, খণ্ড-১৫, পৃ-৬৩৩

[৬৬] *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খণ্ড-১৭, পৃ-৪৮৬

তিনি হিন্দুদের যে সকল মূর্তি ভেঙে ফেলেছিলেন, তন্মধ্যে সবচেয়ে বড় মূর্তিটির নাম ছিল সোমনাথ।[৬৭] অবিশ্বাসী হিন্দুরা এ কথা বিশ্বাস করত, এ মূর্তিটির জীবন ও মৃত্যু দানের ক্ষমতা রয়েছে। তারা এর চতুর্পাশে প্রদক্ষিণ করত এবং মূল্যবান জিনিসপত্র উৎসর্গ করত। এমনকি এটিকে কেন্দ্র করে দশ হাজার জনপদ গড়ে উঠেছিল। নানান রকমের চমকপ্রদ সম্পদ দিয়ে ভরে উঠেছিল সোমনাথ মন্দিরের ভাণ্ডার।

দুই হাজার ব্রাহ্মণ নিয়োজিত মুসলিম রাজ্য এবং এ মন্দিরের মধ্যে ছিল এক মাসের দূরত্ব। সুলতান মাহমুদ ত্রিশ হাজার সৈনিক নিয়ে এ মন্দিরের উদ্দেশে যাত্রা করেন। আল্লাহ তায়ালা মাত্র তিন দিনে এ বিরাট মন্দিরটি মুসলিমদের পদানত করে দেন। সুলতান মাহমুদ লাভ করেন অগণিত সম্পদ।[৬৮] তাতে স্বর্ণমুদ্রাই ছিল বিশ হাজার দিনার সমপরিমাণ। এর মাধ্যমে তিনি ভারতের প্রতাপশালী রাজা জয়পালের শক্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি ধুলোয় মিশিয়ে দেন।

অতঃপর তিনি তুর্কিদের রাজাধিরাজ ইলিক খানকে পরাজিত করেন এবং সামানীয় সাম্রাজ্যের মূলোৎপাটন করেন। তারা প্রায় একশো বছর ধরে খোরাসান, সমরকন্দ এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে রাজত্ব করেছিল। অতঃপর তাদের সাম্রাজ্য বিলীন হয়ে যায়।

সুলতান মাহমুদ দুই লক্ষ দিনার ব্যয় করে আমু দরিয়ার উপর একটি বিশাল সেতু তৈরি করেছিলেন, যা অন্য কোনো রাজা-বাদশা করতে সক্ষম হননি। তার সেনাবাহিনীর সাথে থাকত চারশো লড়াকু হাতি। সেকালে এটি ছিল অনেক বিশাল একটি অর্জন এবং অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ বিষয়।

তার জীবনী বিস্তারিত লিখতে গেলে আলোচনা অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক এবং বিশ্বস্ত একজন ব্যক্তি। উলামায়ে কেরাম ও মুহাদ্দিসগণকে ভালোবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন; তাদের সান্নিধ্য গ্রহণ করতেন এবং তাদের সাথে উত্তম আচরণ করতেন। মাজহাবগত দিক দিয়ে তিনি প্রথমে হানাফি মাজহাবের অনুসারী ছিলেন। অতঃপর আবু বকর আস-সগিরের হাতে শাফেয়ি মাজহাব অবলম্বন করেন।[৬৯] তিনি ছিলেন দ্বীন প্রচারে একনিষ্ঠ এবং বহু যুদ্ধের বিজয়ী বীর। ছিলেন দূরদর্শী, বিচক্ষণ এবং সঠিক সিদ্ধান্তদাতা।

একবার ইবনু ফুরাক[৭০] সুলতান মাহমুদের কাছে এসে বললেন, আল্লাহ তায়ালার জন্য 'উপরে থাকা'র গুণ সাব্যস্ত করা যাবে না। কেননা, যে বস্তু উপরে থাকে, তার

[৬৭] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খণ্ড-১৫, পৃ-৬৩৪

[৬৮] *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খণ্ড-১৭, পৃ-৪৮৫

[৬৯] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খণ্ড-১৫, পৃ-৬৩৪

[৭০] তার নাম 'ইবনু ফুরাক' অথবা 'ইবনু ফাউরাক'—দুটোই প্রচলিত আছে। পুরো নাম আবু বকর মুহাম্মদ ইবনুল হাসান ইবনু ফুরাক আল-আনসারি। জীবনীসংক্রান্ত গ্রন্থগুলোতে তার জন্মতারিখ ও জন্মস্থান সুস্পষ্টভাবে

বিপরীতে নিচও থাকতে হয়। তাই যার জন্য 'উপর' আছে, তার জন্য 'নিচ'ও থাকবে—সেটিই স্বাভাবিক। সুলতান মাহমুদ জবাবে বললেন, আমি আল্লাহ তায়ালার জন্যে 'উপরে থাকা'র গুণ সাব্যস্ত করিনি। বরং তিনি নিজেই তার জন্য 'উপরে থাকা'র গুণ সাব্যস্ত করেছেন। এতে আমার কোনো হাত নেই। এ কথা শুনে ইবনু ফুরাক হতভম্ব হয়ে বেরিয়ে যান। পথিমধ্যেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[৭১]

সুলতান মাহমুদ তার উজির, আমির-উমারা এবং সাথি-সঙ্গীদের খুব সম্মান দিতেন। প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি কোনো বিলম্ব করতেন না। কারও দুর্বলতা এবং ক্লান্তি প্রকাশ করতেন না। আব্বাসি খলিফার উপর ছিল তার প্রবল আস্থা। তিনি ছিলেন খেলাফতের একান্ত অনুগত। আব্বাসি খলিফার উদ্দেশে বিপুল পরিমাণ স্বর্ণালংকার হাদিয়া পাঠাতেন। ছিলেন কারামিতা, ইসমাইলিয়্যা এবং কালামশাস্ত্রবিদদের ঘোর বিরোধী।[৭২]

রায়[৭৩] বিজয়ের পর তিনি খলিফা আল-কাদির বিল্লাহ'র কাছে চিঠি লিখে পাঠান। চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন, বুওয়াইহিয়্যা শাসক মাজদুদ্দৌলাহর অধীনে পঞ্চাশ জনের অধিক স্বাধীন মহিলা এবং তাদের ত্রিশের অধিক সন্তানসন্ততি পেয়েছেন। এ ব্যাপারে মাজদুদ্দৌলাকে জিজ্ঞাসা করা হলে সে উত্তরে বলে, এটি আমার পূর্বসূরিদের রীতি। সুলতান মাহমুদ বাতেনি মতাবলম্বীদের একটি বিশাল অংশকে শূলিতে চড়িয়েছিলেন, মুতাজিলা মতাদর্শ অনুসারীদেরকে খোরাসানে নির্বাসন দিয়েছিলেন এবং দর্শন ও জ্যোতির্বিদ্যার বইসমূহ পুড়িয়ে দিয়েছিলেন।[৭৪]

গজনভি-সেলজুক সংঘাত

সুলতান মাহমুদ সমরদক্ষতা এবং বিচক্ষণতা দিয়ে তার রাজ্যের সীমানা বহু গুণ বিস্তৃত করেছিলেন। ভারতবর্ষে তিনি সতেরোবার বিজয়-অভিযান চালিয়েছিলেন। দাক্ষিণাত্য

উল্লেখ নেই। তবে কেউ কেউ বলেছেন, তিনি ৩৩০ হিজরিতে (৯৪১ খ্রি.) ইস্পাহানে জন্মগ্রহণ করেন। ৪০৬ হিজরি সনে নিশাপুরে বিষক্রিয়ায় নিহত হন তিনি। তিনি শাফেয়ি মাজহাবের অনুসারী ছিলেন। তাফসির, কালাম, ফিকহ, আরবিভাষা ও সাহিত্য ইত্যাদি শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান রাখতেন। এসব বিষয়ে অর্ধশতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন।—অনুবাদক **[উইকিপিডিয়া অবলম্বনে]**

[৭১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খণ্ড-১৭, পৃ-৪৮৭

[৭২] *প্রাগুক্ত*

[৭৩] রায়—ইরানের তেহরান প্রদেশের একটি শহর। দ্বিতীয় খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে নুআইম ইবনু মুকরিনের নেতৃত্বে প্রথমবারের মতো এ শহরটি মুসলিমরা বিজয় করে। হিজরি পঞ্চম শতাব্দীতে সেলজুকরা এখানে একটি টাওয়ার নির্মাণ করে। ২০ মিটার উচ্চতাসম্পন্ন এ টাওয়ারটি এখনো বিদ্যমান আছে, যা 'তুঘরুল টাওয়ার' (বুরজে তুঘরুল) নামে পরিচিত।—অনুবাদক

[৭৪] *আল-কামিল ফিত তারিখ*, *আইয়ুয়িদুত তারিখু নাফসুহ*, পৃ-৬৬-এর উদ্ধৃতি দিয়ে

মালভূমি পর্যন্ত তার অভিযান বিস্তৃত হয়েছিল। এমনিভাবে তিনি পাঞ্জাব প্রদেশকে নিজ রাজত্বের আওতাভুক্ত করে নিয়েছিলেন।

তার সময়ে গজনভি সাম্রাজ্য গজনা এবং হেরাত প্রদেশ করতলগত করে সুদূর মা-ওয়ারাউন-নাহারের সীমানা পর্যন্ত নিজেদের কর্তৃত্ব প্রসারিত করেছিল।[৭৫] এর ফলে তার রাজত্বের সীমানা পৌঁছে গিয়েছিল পূর্বে উত্তর-ভারত, পশ্চিমে ইরাক, উত্তরে খোরাসান, তাখারিস্তান, মা-ওয়ারাউন-নাহারের একাংশ এবং দক্ষিণে সিজিস্তান পর্যন্ত। তিনি লাহোরকে তার ভারত শাসনের মূলকেন্দ্র হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। সেখানে তিনি তার প্রতিনিধি হিসেবে একজন প্রশাসক নিযুক্ত করেছিলেন।[৭৬] এমনিভাবে তিনি বাগদাদের বুওয়াইহিয়্যাদের দমন করার জন্যও ওৎ পেতেছিলেন।[৭৭]

হিজরি পঞ্চম শতাব্দীর শেষদিকে এসে মা-ওয়ারাউন-নাহার অঞ্চলে সেলজুকদের ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তি বেড়ে যায়। ফলে সুলতান মাহমুদের মনে ক্ষোভ তৈরি হয়। এর প্রেক্ষিতে তিনি ৪১৫ হিজরিতে আমু দরিয়া পাড়ি দিয়ে সেলজুকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং সেলজুক নেতা আরসালান, তার পুত্র কুতালমিশ এবং আরও অনেক নেতাকে বন্দি করতে সক্ষম হন। তিনি আরসালানকে ভারতের কারাগারে পাঠিয়ে দেন। সেখানে সাত বছর কারাবরণ করে তার মৃত্যু হয়।[৭৮]

চার বছর পর ৪১৯ হিজরিতে সুলতান মাহমুদ নিসা[৭৯] এবং বাভের্দ[৮০]—এ দুই শহরের বাসিন্দাদের তল্লাশির উপর ভিত্তি করে সেলজুকদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয়বারের মতো যুদ্ধে নামেন এবং তাদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন।[৮১]

দান্দাকানের যুদ্ধ এবং সেলজুকদের উত্থান

গজনভিদের হাতে সেলজুকদের পরাজয়ের পর থেকে সেলজুকরা প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ সন্ধানে ছিল। সুলতান মাহমুদের ইন্তেকালের পর ৪২১ হিজরিতে পুত্র মাসউদ শাসনক্ষমতা গ্রহণ করলে সেলজুকদের জন্য সে সুযোগ চলে আসে।

তারা চাইলেই পারত গজনভি সাম্রাজ্যের উপর বিজয় অর্জন করতে।[৮২] কিন্তু তারা সুলতান মাসউদকে সন্ধির প্রস্তাব দেয় এবং তার আনুগত্যে থাকার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত

[৭৫] *আদ-দাওলাতুস সালজুকিয়্যাহ মুনজু কিয়ামিহা*, পৃ-২৩
[৭৬] *প্রাগুক্ত*
[৭৭] *আখবারুদ দাওলাতিস সালজুকিয়্যাহ লিল হুসাইন*, পৃ-৫১৩
[৭৮] *আন-নুজুমুজ জাহিরাহ*, খণ্ড-৫, পৃ-৫০; *আদ-দাওলাতুস সালজুকিয়্যাহ মুনজু কিয়ামিহা*, পৃ-২৪
[৭৯] তুর্কমেনিস্তানের একটি প্রাচীন নগরী।—অনুবাদক
[৮০] অঞ্চলটি 'বাভার' বা 'বুর' হিসেবেও পরিচিত। ইরানের হোর্মোজগন প্রদেশের একটি অঞ্চল।—অনুবাদক
[৮১] *আদ-দাওলাতুস সালজুকিয়্যাহ মুনজু কিয়ামিহা*, পৃ-২৪

করে। সুলতান মাসউদ তাদের আবেদন গ্রহণ করেন। অতঃপর তাদের হাতে বিভিন্ন প্রদেশের দায়িত্ব অর্পণ করেন, সম্মানজনক উপাধিতে ভূষিত করেন এবং উত্তমরূপে সমাদর করেন।[৮৩] এতদসত্ত্বেও গজনভিরা উপলব্ধি করতে পেরেছিল, সেলজুকরা তাদের জন্য কতটা বিপজ্জনক হতে পারে। তাই সুলতান মাসউদ ৪২৯ হিজরিতে খোরাসানের গভর্নরকে সেলজুকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেন। ফলে সারাখস শহরের অদূরে দু পক্ষের মাঝে এক ভয়ানক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধের মধ্য দিয়েই গজনভি সাম্রাজ্যের বিনাশপর্ব শুরু হয়।

সেলজুকরা তাদের নেতা তুঘরিল বেগের নেতৃত্বে নিশাপুরের দিকে ধাবিত হয়। সেখানে তুঘরিল বেগ নিজেকে সেলজুকদের সুলতান হিসেবে ঘোষণা দেন। একই বছর ৪২৯ হিজরিতে তিনি সুলতান মাসউদ গজনভির সিংহাসন দখল করে নেন।[৮৪] ফলশ্রুতিতে সুলতান মাসউদ নিজের সৈনিকদের নিয়ে খোরাসানের দিকে যাত্রা করেন। অতঃপর দান্দাকান নামক স্থানে সেলজুকদের সাথে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এ যুদ্ধে গজনভিরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। এ ছিল ৪৩১ হিজরির ঘটনা।

এর এক বছর পর, ৪৩২ হিজরিতে সুলতান মাসউদ গজনভি মৃত্যুবরণ করলে তার ছেলে মওদুদ তার স্থলাভিষিক্ত হন। দান্দাকানের যুদ্ধের পর খোরাসানে সেলজুকদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বহু গুণে বেড়ে যায় এবং তারা সে অঞ্চলের মহাপরাক্রমশালী হিসেবে পরিণত হয়।

অন্যদিকে গজনভিদের সামরিক শক্তি হ্রাস পেতে শুরু করে এবং তাদের অধিকাংশ রাজ্য হাতছাড়া হয়ে যায়। অতঃপর ৫৮২ হিজরিতে আফগানিস্তানের গজনভিরা ভারতবর্ষে তাদের রাজক্ষমতা বিস্তারে সমর্থ হয়েছিল।[৮৫]

দান্দাকান যুদ্ধের ফলাফল

- দান্দাকান যুদ্ধ খোরাসানে গজনভি শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটায়। তুঘরিল বেগ রণক্ষেত্রে নিজের সিংহাসন স্থাপন করে সেখান থেকেই শাসনকার্য পরিচালনা শুরু করে দেন। বিভিন্ন এলাকার নেতাগণ এসে তার কাছে খোরাসানের নেতৃত্ব সোপর্দ করতে থাকে।

---

[৮২] *আল-কামিল ফিত তারিখ, আদ-দাওলাতুস সালজুকিয়্যাহ মুনজু কিয়ামিহা*, পৃ-২৫-এর উদ্ধৃতি দিয়ে
[৮৩] *আদ-দাওলাতুস সালজুকিয়্যাহ*, পৃ-২৫
[৮৪] *প্রাগুক্ত*
[৮৫] *প্রাগুক্ত*

- যুদ্ধের পর তুঘরিল বেগ পার্শ্ববর্তী সকল এলাকায় নিজের বিজয়ের খবর জানিয়ে চিঠি লিখে পাঠান।

- সেলজুকদের সামরিক বাহিনী পরাজিত গজনভি বাহিনীকে আমু দরিয়ার তীরবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত পিছু ধাওয়া করে, যাতে করে তারা মা-ওয়ারাউন-নাহারে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় এবং সেলজুকদের বিজয় চূড়ান্ত হয়।

- এ যুদ্ধ একটি প্রাচীন সাম্রাজ্যের বিলুপ্তির মাধ্যমে নতুন মুসলিম সাম্রাজ্যের উত্থান ঘটায়। অনুরূপভাবে এটিকে ইসলামের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ হিসেবে গণ্য করা হয়; বরং দান্দাকানের যুদ্ধ মুসলিম-বিশ্বকে নাড়িয়ে দিয়েছিল এবং মধ্যযুগীর বিশ্বে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল।[৮৬]

- সুলতান মাসউদ কারাখানিদের কাছে প্রেরিত এক পত্রে সেলজুকদের মূলোৎপাটনে পরবর্তী আক্রমণে তাদেরকে পাশে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করলেও দান্দাকানের যুদ্ধের ভয়াবহ ক্ষতি তার সে প্রতিরোধের আগ্রহ মিটিয়ে দেয়। তিনি বুঝতে পারেন, শুধুমাত্র বলখ এবং তার আশেপাশের এলাকা নয়, এখন তাদেরকে গজনি ছেড়েও চলে যেতে হবে। তার সেনাপ্রধানগণ এবং সাম্রাজ্যের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ তাকে এ অমূলক ভয় থেকে ফেরানোর শত চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। শেষ পর্যন্ত তিনি ভারতে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন।[৮৭]

- গজনভিদের উপর বিজয়লাভের পর সেলজুকরা তাদের অধিকৃত অঞ্চলগুলো শাসনের জন্য নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেয়। জাফরির অংশে আসে মার্ভ শহর। এটিকে রাজধানী বানিয়ে তিনি সেখান থেকে শাসনকার্য পরিচালনা করেন এবং খোরাসানের বেশির ভাগ এলাকা অধিগ্রহণ করে নেন।

  আবু আলি হাসান ইবনু মুসার অধীনে আসে বুসত (লস্করগাহ), হেরাত[৮৮], সিজিস্তান[৮৯] এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলো। জাফরির বড় সন্তান কাওয়ারদ লাভ করে তাবাস[৯০] কিরমান[৯১] এবং আশপাশের এলাকাগুলোর

[৮৬] *মাদখালুন ইলা তারিখিল হুরুবিস সলিবিয়্যাহ*, পৃ-২৯

[৮৭] *তারিখুল বাইহাকি*, পৃ. ৭২৭-৭২৮; *তারিখু সালাজিকাতির রুম ফি আসিয়া আস-সুগরা*, মুহাম্মদ তাক্কুশ, পৃ-২৯

[৮৮] হেরাত: খোরাসানের একটি বড় শহর।—ইয়াকুত আল হামাভি, ৫/৩৯৬

[৮৯] সিজিস্তান: একটি বড় প্রদেশ। হেরাত ও সিজিস্তানের মাঝে দশ দিনের দূরত্ব।

[৯০] তাবাস: নিশাপুর ও ইস্পাহানের মধ্যবর্তী একটি ছোট শহর।—ইয়াকুত হামাভি, ৪/৩০

[৯১] কিরমান: গ্রাম, শহর, শহরতলি সমৃদ্ধ প্রসিদ্ধ এবং বিশাল একটি প্রদেশ। ইরান, মাকরান, সিজিস্তান ও খোরাসানের মাঝে অবস্থিত।